বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

Bangladesh Competition Commission

সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

সমীক্ষার বিষয়: সিমেন্টের বাজার

সিমেন্টের বাজার বিষয়ক
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সিমেন্টের বাজার বিষয়ক
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রধান সম্পাদক:
প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সমীক্ষা তত্ত্বাবধানে:
সালমা আখতার জাহান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মোঃ হাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সমীক্ষা, গবেষণা ও রচনায়:

সমীক্ষা দল-০১

জনাব মোঃ মাহবুব আলম
আহবায়ক (উপ-পরিচালক, সিনিয়র সহকারী সচিব)
জনাব নাঈমুর রহমান
সদস্য (সহকারী পরিচালক)

মুদ্রণ : প্রিন্টিং জোন

স্বত্ব ও প্রকাশক :
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ বিষয়টি আমলে নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর বিধানমতে সিমেন্টের বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলে সিমেন্টের বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকবে। ফলে উৎপাদক হতে ভোক্তা পর্যন্ত সরবরাহ শৃঙ্খলের (Supply chain) সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবে। তাই কমিশনের সময়োপযোগী এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে তথ্য, পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি কমিশনের প্রত্যেক সদস্য মহোদয়ের প্রতি যাদের দিকনিদের্শনা এবং উৎসাহে একটি যুগোপযোগী এবং তথ্যবহুল সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের সহকর্মীদের তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা আমাদেরকে বারংবার কৃতজ্ঞতার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আরও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতি যাদের সহযোগিতা ছাড়া প্রতিবেদনটি সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

সর্বোপরি অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এঁর প্রতি যার সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও সহায়তার মাধ্যমে সুনিপুণভাবে সিমেন্ট শিল্পের বাজার সমীক্ষা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সমীক্ষার সার-সংক্ষেপ (Executive Summary):

সরকার নির্ধারিত ০৯টি অত্যাবশকীয় পণ্যের মধ্যে সিমেন্ট একটি। বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ও সিমেন্টের বাজার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য এই সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি একটি বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক সমীক্ষা প্রতিবেদন। সমীক্ষা প্রতিবেদনটির শুরুতে সমীক্ষার উদ্দেশ্য, সমীক্ষা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল, সমীক্ষার আউটলাইন ও সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষাটির পরবর্তী অংশ সাহিত্য পর্যালোচনায় সিমেন্ট শিল্পের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি অংশে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে।

সিমেন্ট শিল্পের ইতিহাস ও বিকাশ সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সক্ষমতা, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সম্পর্কে এই সমীক্ষা প্রতিবেদনের অধ্যায়-৪ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশে বাংলাদেশের বিকাশমান সিমেন্ট শিল্পের চিত্র উঠে এসেছে যেখানে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প গড়ে প্রায় ৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উক্ত সময়ে সিমেন্টের বাৎসরিক চাহিদা ৩১ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৪০.৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হয়েছে। তবে দেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে এর প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বাংলাদেশে সরকারি অবকাঠামো উন্নয়নে সিমেন্টের ব্যবহার মোট চাহিদার ৩৫%, ব্যক্তি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার ৪০% এবং বাকি ২৫% আবাসন খাতে। বাংলাদেশে মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার ২০১১ সালে ৯৫ কেজি থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০২০ সালে প্রায় ২০০ কেজি হয়েছে। গত দুই দশকে এই শিল্পের বিশাল প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের তুলনামূলক কম সিমেন্ট গ্রাহকদের মধ্যে একটি।

এক সময় সিমেন্ট আমদানি নির্ভর বাংলাদেশ এখন সিমেন্ট রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯.৫৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের সিমেন্ট রপ্তানি করে যা পূর্বের বছরের তুলনায় প্রায় ৩১.৮২% বেশি। এই রপ্তানির প্রধান গন্তব্য ভারত। সরকারের ব্যাপক অবকাঠামো বিনিয়োগ, রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান শহুরে জনসংখ্যা এবং চিত্তাকর্ষক জিডিপি বৃদ্ধির কল্যাণে সিমেন্টের চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে। বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বাংলাদেশকে সিমেন্ট উৎপাদনের কাঁচামাল, ক্লিংকার, জিপসাম, লাইমস্টোন, ফ্লাই এ্যাশ ও স্লাগ সিংহভাগই আমদানি করতে হয়। সিমেন্ট উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৭৫% কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয় হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যয় মোট ব্যয়ের প্রায় ১০%।

সিমেন্ট শিল্প ও বাজারের সাথে সম্পর্কিত আইন ও বিধি এবং বাজার পর্যবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের বিষয়েও প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে। সিমেন্টের বাজারের সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সিমেন্টের বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিমেন্টের বাজারের গঠন পর্যালোচনা। এ লক্ষ্যে মার্কেট শেয়ার নির্ণয় করে দেখা যায় যে, শীর্ষ ১০টি কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ৫৭.২৮%। CR4 পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, সিমেন্টের বাজারে Low Concentration বিদ্যমান অর্থাৎ বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

সিমেন্টের বাজারের বিভিন্ন কোম্পানির সিমেন্টের দাম একে অপরের খুব কাছাকাছি। বাজারে সমজাতীয় পণ্যের বহুল উপস্থিতির কারণে মূল্য নির্ধারণ এই বাজারের একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে সিমেন্ট শিল্প যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং আগামী বছরগুলোতে এই শিল্পের যে সকল সম্ভাবনা রয়েছে তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে সিমেন্ট শিল্পের নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে সমীক্ষায় আলোচনা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

ছকের তালিকা I

চিত্রের তালিকা I

সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronym) II

অধ্যায় ১: প্রাক-কথন ১

১.১) ভূমিকা ১

১.২) সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার লক্ষ্যে দল গঠন ১

১.৩) সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) ১

১.৪) সমীক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Results) ২

১.৫) সমীক্ষার আউটলাইন (Outline of the Study) ২

১.৬) সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the study) ২

অধ্যায় ২: সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) ৩

অধ্যায় ৩: কার্যপদ্ধতি (Methodology) ৪

৩.১) তথ্যের উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Sources and Collection Techniques) ৪

৩.২) সংগৃহীত তথ্য (Collected Data) ৪

৩.৩) সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন ৫

৩.৪) সংগৃহীত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of the Collected Data) ৫

অধ্যায়-৪: বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ৬

৪.১) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ও বাজার সম্পর্কিত রেগুলেশন ৭

৪.২) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ও বাজারের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ ৭

৪.৩) সিমেন্ট কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য স্ট্যান্ডার্ডসমূহ ৭

৪.৪) উৎপাদন সক্ষমতা ও চাহিদা ৭

৪.৪.১) সিমেন্টের মৌসুমি চাহিদা ৮

৪.৫) খাতওয়ারি সিমেন্টের ব্যবহার ৯

৪.৫.১) মেগা প্রকল্প: সিমেন্ট শিল্পের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি ৯

৪.৬) সিমেন্ট রপ্তানি চিত্র ৯

৪.৭) সিমেন্টের কাঁচামাল ১০

৪.৭.১) সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানি তথ্য ১১

৪.৭.২) প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদনে কাঁচামালের ব্যবহার ১২

৪.৮) সিমেন্টের উৎপাদন ব্যয় কাঠামো ১২

৪.৯) সিমেন্ট শিল্পে কর কাঠামো ১২

৪.১০) বিশ্বব্যাপী সিমেন্ট বাজারের তুলনায় বাংলাদেশের বাজারের অবস্থান ১৩

৪.১১) তুলনামূলক বার্ষিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার ১৪

৪.১২) সিমেন্টের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) ১৫

অধ্যায়-৫: সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রোফাইল বিশ্লেষণ ১৬

৫.১) সিমেন্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া ১৬

৫.২) সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ১৬
৫.৩) বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানা সমূহ ১৬
৫.৪) শীর্ষ সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল বিশ্লেষণ ১৭
৫.৪.১) বসুন্ধরা সিমেন্ট ১৭
৫.৪.২) আকিজ সিমেন্ট ১৭
৫.৪.৩) হোলসিম বাংলাদেশ ১৭
৫.৪.৪) শাহ সিমেন্ট ১৭
৫.৪.৫) সেভেন রিংস সিমেন্ট ১৮
৫.৪.৬) হাইডেলবার্গ সিমেন্ট (স্ক্যান সিমেন্ট) ১৮
৫.৪.৭) প্রিমিয়ার সিমেন্ট ১৮
৫.৪.৮) ফ্রেশ সিমেন্ট ১৮
৫.৪.৯) ক্রাউন সিমেন্ট ১৯
৫.৪.১০) আমান সিমেন্ট ১৯
৫.৪.১১) ছাতক সিমেন্ট ১৯
৫.৫) পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত সিমেন্ট কোম্পানিসমূহ ২০
৫.৬) বাংলাদেশে সিমেন্ট খাতে বিদেশি কোম্পানি ২০
৫.৭) কোম্পানিভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা ২০
৫.৮) সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের এ্যাসোসিয়েশন ২১
৫.৯) সিমেন্টের মূল্য সূচক ২১
৫.১০) সিমেন্ট শিল্পে মার্জার ও এ্যাকুইজিশন ২১
অধ্যায়-৬: বাংলাদেশের সিমেন্টের বাজার কাঠামো ২২
৬.১) সিমেন্টের বাজার কাঠামো (Market Structure) পর্যালোচনা ২২
৬.১.১) শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ২৩
৬.১.২) CR4 ভিত্তিক মতামত ২৪
৬.১.৩) HHI ভিত্তিক মতামত ২৫
অধ্যায়-৭: বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ২৬
৭.১) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের সম্ভাবনা ২৬
৭.২) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের চ্যালেঞ্জ ২৬
৭.৩) জলবায়ু পরিবর্তনে সিমেন্ট শিল্পের প্রভাব ২৭
অধ্যায়-৮: সমীক্ষালব্ধ ফলাফল (Findings) ও সুপারিশসমূহ (Recommendations) ২৯
৮.১) সমীক্ষালব্ধ ফলাফল (Findings) ২৯
৮.২) সুপারিশসমূহ (Recommendations) ২৯
উপসংহার (Conclusion) ৩০
রেফারেন্স (References) ৩১

ছকের তালিকা

ছক-১: সিমেন্টের বাজার সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদির বিবরণ ৪
ছক-২: একনজরে বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ৬
ছক-৩: বাংলাদেশে সিমেন্টের বাৎসরিক চাহিদা ৮
ছক-৪: সিমেন্টের প্রধান গ্রাহক ৯
ছক-৫: দেশের চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ ৯
ছক-৬: সিমেন্ট রপ্তানি চিত্র ১০
ছক-৭: কাঁচামাল আমদানির উৎস্য দেশ ১১
ছক-৮: বাংলাদেশের সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানি তথ্য ১১
ছক-৯: সিমেন্ট উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত চারটি প্রধান ব্যয় ১২
ছক-১০: সিমেন্ট শিল্পের কর কাঠামো ১৩
ছক-১১: বিশ্বের শীর্ষ ৫ (পাঁচ) টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী দেশ ১৩
ছক-১২: তুলনামূলক বার্ষিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার ১৪
ছক-১৩: বাংলাদেশে সিমেন্ট খাতে বিদেশি কোম্পানি ২০
ছক-১৪: কোম্পানিভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা ২০
ছক-১৫: সিমেন্টের মূল্য সূচক ২১
ছক-১৬: ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার ভিত্তিতে বাজারের গঠন প্রকারভেদ ২২
ছক-১৭: মার্কেটের Concentration এর মাত্রা সম্পর্কে উল্লিখিত সীমা ২২
ছক-১৮: HHI এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা ২৩
ছক-১৯: শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ২৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র-১: সমীক্ষা দল কর্তৃক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন ৫
চিত্র-২: বাংলাদেশে সিমেন্টের বাৎসরিক চাহিদা ৮
চিত্র-৩: সিমেন্ট রপ্তানি ট্রেন্ড ১০
চিত্র-৪: প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদনে কাঁচামালের ব্যবহার ১২
চিত্র-৫: বিশ্বব্যাপী সিমেন্টের বাজারের আকার ১৩
চিত্র-৬: বার্ষিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার ১৪
চিত্র-৭: সরবরাহ শৃঙ্খলের ফ্লো-চার্ট ১৫
চিত্র-৮: সিমেন্টের মূল্য সূচক ২১
চিত্র-৯: শীর্ষ ১০টি কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ২৪

সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronym)

ADP	: Annual Development Plan.
ASM	: American Standard Method.
BBS	: Bureau of Statistics.
BCIC	: Bangladesh Chemical Industries Corporation.
BCMA	: Bangladesh Cement Manufacturers Association.
CAGR	: Compound Annual Growth Rate.
CCI	: Competition Commission of India.
CR4	: Concentration Ratio 4.
EBL	: Eastern Bank Limited.
ESM	: European Standard Method.
HHI	: Herfindahl Hirschman Index.
LGED	: Local Government and Engineering Department.
OPC	: Ordinary Portland Cement.
PCC	: Portland Composite Cement.
PWD	: Public Works Department.
SAMR	: State Administration for Market Regulation.
VRM	: Vertical Roller Mill.

অধ্যায় ১: প্রাক-কথন

এ অধ্যায়ে সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার ভূমিকা, সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার অনুপ্রেরণা, সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার লক্ষ্যে দল গঠন, সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার উদ্দেশ্য, সমীক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সমীক্ষার আউটলাইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১) ভূমিকা

একটি দেশ কতটা উন্নত তা পরিমাপের অন্যতম একটি মানদণ্ড হলো সে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে সিমেন্ট শিল্পের কতটা প্রসার ঘটেছে এবং এ পণ্যটি কতটা সহজলভ্য হয়েছে। অগ্রসরমান জাতীয় অর্থনীতি বহুলাংশেই তার উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির আকার বড় হওয়ার সাথে সাথে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নির্মিত অবকাঠামোর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিমেন্ট হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে সিমেন্টের চাহিদা বাড়তে থাকে। সরকারের বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের সিমেন্ট শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটছে। আগামী দুই দশকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাথে স্টিল শিল্পের আকার আরো বড় হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্য ৯ এর টার্গেট ৯.১:

" সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী ও ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ।"

নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সিমেন্ট একটি অতীব জরুরি পণ্য। সেই বিবেচনায় সিমেন্ট শিল্প দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এই শিল্পের প্রসারের জন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ বাজারে ডলারের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে কিছু পণ্যের দাম অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, সিমেন্ট তার মধ্যে অন্যতম। এ দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজার দর ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সিমেন্টের বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এটির বাজার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা জরুরি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক সিমেন্টের বাজার সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা ও ডাটাবেজ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দেশে সিমেন্টের বাজার দ্রুত বাড়ছে। শুধু রাজধানী ঢাকা বা বড় শহর নয়, সিমেন্টের চাহিদা তৈরি হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। তবে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সিমেন্টের এই চাহিদার সিংহভাগ মেটাচ্ছেন দেশীয় উদ্যোক্তারা। তাঁরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো জটিল অবকাঠামোতে যেমন সিমেন্ট সরবরাহ করছেন তেমনি সাধারণ ভবনের সিমেন্টও তাঁদের কারখানায় তৈরি। গুণগত মান, সরবরাহের সক্ষমতা কিংবা বিপণন কৌশল, কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই দেশীয় কোম্পানিগুলো। ফলে একসময় সিমেন্ট খাতে বিদেশি কোম্পানিগুলোর যে বাজার হিস্যা ছিল, তা কমে গেছে। ভারী শিল্পে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতার অন্যতম উদাহরণ সিমেন্ট খাত। বর্তমানে দেশে ৩৫টি সিমেন্ট কোম্পানি উৎপাদনে আছে। এর মধ্যে ৩১টি দেশীয় কোম্পানি।

১.২) সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার লক্ষ্যে দল গঠন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা বিষয়ক ১২-১২-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিমেন্টের বাজার সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা এবং ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ আবু মাসুদ, সচিব, আহবায়ক, জনাব মোঃ মাহবুব আলম, উপপরিচালক, সদস্য; জনাব নাঈমুর রহমান, সহকারী পরিচালক, সদস্যকে নিয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ প্রণয়ন দল-০১ গঠিত হয়।

১.৩) সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

(ক) সিমেন্ট শিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন;

(খ) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পে শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ;

(গ) সিমেন্ট শিল্প ও বাজার পর্যবেক্ষণকারী (Regulatory) কর্তৃপক্ষ চিহ্নিতকরণ;

(ঘ) সিমেন্ট শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ;

(ঙ) আইনের ধারা অনুসারে সমীক্ষা প্রকাশ;

(চ) সিমেন্টের বাজারে সরবরাহ চেইন (Supply Chain) সম্পর্কে ধারণা অর্জন;

(ছ) সিমেন্টের বাজারে বিদ্যমান কোম্পানিগুলোর মার্কেট শেয়ার নির্ধারণ;

(জ) সিমেন্টের বাজার কাঠামো (Structure) সম্পর্কে ধারণা লাভ;

(ঝ) সিমেন্টের বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

১.৪) সমীক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Results)

(ক) সিমেন্ট শিল্পের সূচনা, অগ্রগতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে;

(খ) সিমেন্টের বাজার পর্যবেক্ষণকারী (Regulatory) কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে জানা যাবে;

(গ) সিমেন্টের বাজার কাঠামো (Structure) সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা যাবে।

(ঘ) সিমেন্টের বাজারে বিদ্যমান কোম্পানিগুলোর মার্কেট শেয়ার নির্ণয় করা যাবে;

(ঙ) মার্কেট শেয়ারের ভিত্তিতে সিমেন্টের বাজারে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা যাবে;

(চ) সিমেন্টের বাজার সরবরাহ চেইন (Supply Chain) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে;

(ছ) সিমেন্টের বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা যাবে।

১.৫) সমীক্ষার আউটলাইন (Outline of the Study)

(ক) অধ্যায়-২ এ সিমেন্ট শিল্প সম্পর্কে সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) করা হয়েছে;

(খ) অধ্যায়-৩ এ সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে;

(গ) অধ্যায়-৪ এ বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে;

(ঘ) অধ্যায়-৫ এ বাংলাদেশের সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রোফাইল বিশ্লেষণ করা হয়েছে;

(ঙ) অধ্যায়-৬ এ বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্পের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে;

(চ) অধ্যায়-৭ এ বাংলাদেশের সিমেন্টের বাজার কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে;

(ছ) অধ্যায়-৮ এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল (Findings) ও সুপারিশ (Recommendation) প্রদান করা হয়েছে।

১.৬) সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the study)

(ক) সিমেন্টের বাজার সমীক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো যথাযথ তথ্যের ঘাটতি;

(খ) সিমেন্ট উৎপাদনকারী ও পাইকারী বিক্রেতাদের সম্পর্কে তথ্য ভাণ্ডারের অভাব;

(গ) সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানে অনীহা;

(ঘ) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে Statistical Tools সম্পর্কে ধারণার অপ্রতুলতা।

অধ্যায় ২: সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

বাংলাদেশের সিমেন্টের বাজারের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণে বাজার সমীক্ষা হতে পারে অন্যতম টুলস। বিশ্বের বেশ কিছু Competition Agency সিমেন্টের বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তা নির্মূলে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় ১০টি সিমেন্ট কোম্পানি যোগসাজসের মাধ্যমে সিমেন্টের মূল্য নির্ধারণ করায় ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন (CCI) কর্তৃক ২০১২ সালে সংশ্লিষ্ট ১০টি সিমেন্ট কোম্পানিকে ৬৩১৭ কোটি রুপি জরিমানা করা হয়। উল্লেখ্য, একই মামলায় ভারতীয় সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশনকে ৭৩ কোটি রুপি জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২২ সালে China's State Administration for Market Regulation (SAMR) ১৩টি সিমেন্ট কোম্পানিকে সিমেন্টের বাজারে কার্টেল করায় ৬৫.৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার জরিমানা করে। এপ্রিল ২০২৩ মাসে সৌদি এন্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ একই ধরনের অভিযোগে সে দেশের ১৪টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানিকে ৩৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার জরিমানা করেছে।

সেপ্টেম্বর ২০২০ এ প্রকাশিত "Cooperation to Cartelisation: Anti-Competitive Behaviour in Cement Industry in India" শীর্ষক গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, সিমেন্টের বাজার ওলিগোপলিস্টিক প্রকৃতির হওয়ায় কোম্পানিসমূহের যোগসাজসের কারণে প্রতিযোগিতার ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ এ বাজারে প্রায়ই দৃশ্যমান হয়। গবেষণায় আরো বলা হয় যে, কার্টেল করতে ইচ্ছুক এমন সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের আড়ালে কার্টেল করার সুযোগ খুঁজে এবং কার্টেলে অংশগ্রহণকারীরা এ্যাসোসিয়েশনের সভায় তাদের মূল উদ্দেশ্য গোপন রাখে। ফলে কার্টেলের বিষয়টি খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে গবেষকদের প্রচেষ্টায় কিছু টুলস তৈরি করা হয়েছে যা ব্যবহার করে প্রতিযোগিতা কমিশন সুনির্দিষ্ট নির্দেশক (Indicators) নির্ধারণপূর্বক কার্টেলের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে পারে এবং বাজারে প্রভাব ফেলার পূর্বেই তা প্রতিরোধ করতে পারে। তাই এই সব ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের আড়ালে কার্টেল তৈরি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশন ভূমিকা রাখতে পারে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।

EBL Securities Limited কর্তৃক আগস্ট'২০১৯ এ প্রকাশিত "Bangladesh Cement Industry: Resilient; Better Days Await" শীর্ষক গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এ শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কাঁচামালই আমদানি করতে হয়। কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, সাম্প্রতিক সময়ে কর কাঠামোতে পরিবর্তন, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদনকারীদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে। তবে অবকাঠামো খাতে সরকারের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ, প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি, আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে সিমেন্ট শিল্পে বর্তমানের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা করা যায় বলে গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়।

২০২০ সালে প্রকাশিত "Assessment of ambient air quality and health risks due to air pollution in the vicinity of cement plants in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণাপত্রে আলোচনা করা হয় যে, বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াগুলির মতোই। যার মধ্যে কাঁচামাল নিষ্কাশন, ক্লিংকার উৎপাদন এবং চূড়ান্ত পণ্যের গ্রাইন্ডিং এবং প্যাকেজিং জড়িত। বায়ু দূষণ, পানির ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো পরিবেশগত সমস্যা বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণাপত্রটিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, সিমেন্ট শিল্প বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। গবেষণায় পরিবেশগত প্রভাব কমাতে উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় ৩: কার্যপদ্ধতি (Methodology)

অধ্যায়-৩ এ সিমেন্টের বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের উৎস, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের কার্যপদ্ধতি এবং সংগৃহীত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১) তথ্যের উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Source and Collection Techniques)

সিমেন্ট এবং বিদ্যমান সকল সিমেন্ট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমীক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র, টেলিফোন ও ই-মেইল মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সমীক্ষা সহায়ক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.২) সংগৃহীত তথ্য (Collected Data)

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সিমেন্ট কোম্পানি হতে এই মার্কেট সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে:

ছক-১: সিমেন্টের বাজার সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদির বিবরণ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান	সংগৃহীত তথ্যাদির বিবরণ	মন্তব্য
১।	• শাহ সিমেন্ট • বসুন্ধরা সিমেন্ট • ফ্রেশ সিমেন্ট • ক্রাউন সিমেন্ট • প্রিমিয়ার সিমেন্ট • লাফার্জ সিমেন্ট • আকিজ সিমেন্ট • সেভেন রিংস সিমেন্ট • হাইডেলবার্গ সিমেন্ট • আমান সিমেন্ট লিমিটেড	(১) বাৎসরিক সিমেন্ট উৎপাদন সক্ষমতা ও উৎপাদনের পরিমাণ; (২) বাজারে ব্যাগপ্রতি সিমেন্টের বিক্রয় মূল্য; (৩) উৎপাদন খরচ বিবরণী (Cost analysis sheet); (৪) সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ; (৫) সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানির মূল্যহার; (৬) সিমেন্টের কাঁচামালের উপর প্রদত্ত শুল্ক হার; (৭) কোম্পানির বিক্রয় ও বিতরণ কাঠামো; (৮) সিমেন্টের কাঁচামাল বন্দরে আসা পর্যন্ত Landing Cost।	লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট ও ক্রাউন সিমেন্ট তাদের নিকট চাহিত তথ্যাদি পত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করেছে। এছাড়া বাকি ০৮টি কোম্পানির তথ্য তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
২।	বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ)	(১) দেশে সিমেন্টের বাৎসরিক মোট চাহিদা; (২) দেশে সিমেন্টের বাৎসরিক মোট উৎপাদন; (৩) বিসিএমএ'র সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কোম্পানিভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদানের পরিমাণ (মেট্রিক টন)।	বিসিএমএ'র ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	জুলাই'২০১৭ থেকে জুন'২০২২ পর্যন্ত লাইম স্টোন, ক্লিঙ্কার, জিপসাম, ফ্লাই অ্যাশ আমদানির পরিমাণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট চাহিত তথ্য যথাযথভাবে প্রেরণ করেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সিমেন্ট এর বাজার ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সাপ্লাই চেইন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সহায়ক উৎস (Secondary Source) হিসেবে ইতোমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণা কর্ম, পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত সিমেন্ট কোম্পানিগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও পত্র-পত্রিকার সহায়তা নেয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে 4- Firm Concentration Ratio এবং Herfindahl Hirschman Index ব্যবহৃত হয়েছে।

৩.৩) সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন

সিমেন্টের বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভ্যালিডেশন সেমিনারের আলোচকগণের সুপারিশ মোতাবেক সিমেন্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শনপূর্বক সম্যক ধারণা লাভ এবং সমীক্ষা প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সমীক্ষা দল কর্তৃক ০৯-০৭-২০২৩ তারিখ ক্রাউন সিমেন্টের পশ্চিম মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জস্থ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সমীক্ষাদলকে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি এর সিনিয়র জিএম (হেড অব অপারেশনস) ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম সিরাজুল হক। এছাড়া জনাব আবু আহমেদ জাহিদ, ডিজিএম, ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি সমীক্ষা দলকে ফ্যাক্টরি পরিদর্শনকালে সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে সমীক্ষা দল ক্রাউন সিমেন্টের কাঁচামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। পরিদর্শনকালে জানা যায় ক্রাউন সিমেন্ট ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে ক্লিংকার, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব থেকে জিপসাম, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে লাইমস্টোন এবং জাপান ও ভিয়েতনাম থেকে স্লাগ আমদানি করে। এছাড়া ফ্লাই এ্যাশের উৎস্য হলো পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ক্রাউন সিমেন্ট ভিআরএম এবং বল মিল উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহার করে সিমেন্ট উৎপদন করছে। ভিআরএম প্রযুক্তিতে সিমেন্ট উৎপাদন ব্যয় বল মিল প্রযুক্তি অপেক্ষা তুলনামূলক কম।

চিত্র-১: সমীক্ষা দল কর্তৃক ক্রাউন সিমেন্টের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন

৩.৪) সংগৃহীত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of the Collected Data)

সিমেন্টের মার্কেটটি বিগত ৫ বছরে (২০১৭-২০২২) কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে বা উক্ত মার্কেটের গতিপ্রকৃতি (Trend) কেমন তা জানতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন তথ্য যেমন: বাৎসরিক সিমেন্টের উৎপাদন সক্ষমতা ও উৎপাদনের পরিমাণ, বাজারে সিমেন্টের বিক্রয় মূল্য, উৎপাদন খরচ বিবরণী (Cost Analysis Sheet), কাঁচামাল আমদানির পরিমান, কাঁচামাল আমদানির মূল্যহার, কাঁচামালের উপর প্রদত্ত শুল্ক হার, কোম্পানির বিক্রয় ও বিতরণ কাঠামো ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বিশ্লেষণপূর্বক সিমেন্টের মার্কেটের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ (Trend Analysis) করা অতীব জরুরি।

তাছাড়াও, সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে এই বাজার সম্পর্কে একটি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল ডাটাবেজ প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এটি ভবিষ্যতে এই সিমেন্টের মার্কেট সম্পর্কে যেকোন প্রাথমিক ধারণা লাভের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস্য হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং বলা যায়, সিমেন্টের মার্কেট সম্পর্কে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য এ বাজার সমীক্ষা পরিচালনার সাথে যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।

অধ্যায়-৪: বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প

এক সময়ে দেশের বাজারে বিদেশি সিমেন্টের রাজত্ব থাকলেও সেটি এখন পুরোপুরিই দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে। ক্রমেই তার পরিসর বাড়ছে। বলা চলে সিমেন্টের বাজার এখন প্রায় পুরোপুরিই দখলে রেখেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন সিমেন্ট কারখানাগুলি প্রায় ৮৪% শতাংশ এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বাকি ১৬% সিমেন্ট উৎপাদন করে। শুধু তাই নয়, দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশি সিমেন্ট অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। গুণগত মানসম্পন্ন বাংলাদেশি সিমেন্টের কদর বিশ্ব বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্ভাবনাময় সিমেন্ট শিল্পের এ উত্থানের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে। বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প অনেক পুরনো হলেও সম্প্রতি এ শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। সরকার এ খাত থেকে প্রতি অর্থবছরে প্রায় এক হাজার কেটি টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকে।

গেল দুই দশক ধরে বাংলাদেশে সিমেন্ট খাতে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শাণিত হয়। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সালে জনপ্রতি মাত্র ৯৫ কেজি সিমেন্টের ব্যবহার হয়েছিল এবং ২০২০ সালে তার ২০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। গত বছর দেশে মোট ব্যবহার হয়েছে ৩.৯ কোটি টন সিমেন্ট। বিপুল এ চাহিদার প্রায় সিংহভাগই জোগান দিয়ে যাচ্ছে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো। যে অল্প কয়েকটি খাতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রপ্তানি করার ক্ষমতা রাখে, সেগুলোর মধ্যে সিমেন্ট শিল্প হচ্ছে অন্যতম।

সিমেন্ট শিল্পে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম একটি উদীয়মান দেশ। দেশে প্রথম সিমেন্ট কারখানা হয় ১৯৪১ সালে, সিলেটের ছাতক উপজেলার সুরমা নদীর তীরে। নাম ছিল আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানি। স্বাধীনতার পরে ছাতক সিমেন্ট বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) অধীনে ন্যাস্ত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে চিটাগাং সিমেন্ট ক্লিংকার অ্যান্ড গ্রাইন্ডিং ফ্যাক্টরি নামের একটি কারখানা হয়, যা বর্তমানে হাইডেলবার্গ সিমেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের সিমেন্টের মোট চাহিদা প্রায় ৯৫% শতাংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হতো। কিন্তু ঐ দশকের শেষের দিকেই এই দৃশ্য বদলে যেতে শুরু করে এবং বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ৭৫ টির মতো সিমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত দুই দশক ধরে দেশের সিমেন্ট শিল্প অনেক এগিয়েছে। বাংলাদেশের সিমেন্টের মানও অনেক উন্নত হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের সিমেন্ট উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। বর্তমানে দেশে ৩৫ টি সিমেন্ট কারখানা উৎপাদন করছে। দেশে এখন সিমেন্টের চাহিদার পরিমাণ ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, সেখানে বর্তমানে উৎপাদন সক্ষমতা হচ্ছে ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এখন দেশের চাহিদা পূরণ করে সিমেন্ট রপ্তানি করা হয়। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য, মিয়ানমার ও নেপালে সিমেন্ট রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ আছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটানে পণ্যের অবাধ যাতায়াত সম্ভব হলে বাংলাদেশের সিমেন্ট রপ্তানি বাড়তে পারে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

দেশের ভারী শিল্পের মধ্যে এ খাত বড় অংশ দখল করে আছে। উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে দেশের সিমেন্টে। সাশ্রয় হচ্ছে কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। তাছাড়া রপ্তানির মাধ্যমে উল্টো বৈদিশেক মুদ্রা আয়েরও নতুন পথ খুলেছে এ খাত ঘিরে। প্রায় দেড় দশক আগে সিমেন্ট রপ্তানির দ্বার খুলেছিল। তবে পরবর্তী সময়ে সিমেন্ট রপ্তানি প্রত্যাশা মত বাড়েনি। উত্তর পূর্ব ভারতের সীমান্ত অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও উন্নতি হলে রপ্তানিকারকদের জন্য সহায়ক হবে।

ছক-২: একনজরে বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প

কোম্পানিগুলোর মোট উৎপাদন সক্ষমতা	৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন
দেশে মোট চাহিদা	৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন
বর্তমানে বাংলাদেশে মোট সিমেন্ট কোম্পানির সংখ্যা	৩৫টি
সিমেন্ট কোম্পানিগুলোর মোট প্লান্ট সংখ্যা	৪২টি
মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার	২০০ কেজি

দেশীয় কোম্পানির মোট মার্কেট শেয়ার	৮৪%
বিদেশী কোম্পানির মোট মার্কেট শেয়ার	১৬%
সিমেন্ট শিল্পের আকার	৪২০০০ কোটি টাকা
সিমেন্ট উৎপাদনে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান	৪০ তম
সিমেন্ট শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট কর্মসংস্থান	প্রায় ১০ লক্ষ

সূত্র: বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন ও দি সিমেন্ট মার্কেট রিপোর্ট ২০২২

৪.১) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ও বাজার সম্পর্কিত রেগুলেশন

(১) খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২;
(২) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮;
(৩) অত্যাবশকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬;
(৪) বয়লার আইন, ২০২২;
(৫) কারখানা আইন, ১৯৬৫;
(৬) পরিবেশ আদালত আইন, ২০১২;
(৭) জাতীয় শিল্প নীতি, ২০২২;
(৮) ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০০৮;
(৯) ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯;
(১০) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯;
(১১) প্রতিযোগিতা আইন ২০১২;

৪.২) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প ও বাজারের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ

(১) শিল্প মন্ত্রণালয়
(২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(৩) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
(৪) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট
(৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(৬) ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
(৭) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
(৮) পরিবেশ অধিদপ্তর

৪.৩) সিমেন্ট কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য স্ট্যান্ডার্ডসমূহ

(১) আইএসও ৯৫৯৭:২০০৮ (সিমেন্টের স্ট্যান্ডার্ড কনসিসটেন্সি, সেটিং টাইম ও সাউন্ডনেস পরীক্ষা)
(২) আইএসও ৬৭৯:২০০৯ (সিমেন্টের শক্তি নির্ধারণ)
(৩) বিডিএস ইএন ১৯৬-১ এবং ১৯৭-৩:২০১৩ (সিমেন্ট পরীক্ষা পদ্ধতি)
(৪) আইএসও ৯০০১:২০১৫ (গুণগত মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
(৫) আইএসও ১৪০০১:২০১৫ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
(৬) আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ (পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)

৪.৪) উৎপাদন সক্ষমতা ও চাহিদা

উৎপাদনে থাকা ৩৫ কারখানার বার্ষিক স্থাপিত উৎপাদন সক্ষমতা ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। যদিও দেশে চাহিদা ততটা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বার্ষিক সিমেন্টের মোট চাহিদা ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এ কারণে সিমেন্ট কারখানাগুলো উৎপাদন সক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করতে পারে না। ২০২২ সালের হিসেবে দেশে ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন সিমেন্ট বিক্রি হয়েছে। প্রতি টন ১০,৮০০ টাকা হিসাবে সিমেন্টের

বাজারের আকার প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। ২০১২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সিমেন্ট খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে আড়াই গুণের মতো। গত সাত বছরে, সিমেন্ট শিল্পের CAGR ছিল প্রায় ১১.৫%। মূলত সরকারের অবকাঠামো খাতের প্রকল্পগুলোকে কেন্দ্র করেই এ খাতের উদ্যোক্তারা নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়েছেন। নব্বইয়ের দশকের আগে দেশে সিমেন্ট কারখানা ছিল মাত্র দুটি। সেই সময় আমদানির মাধ্যমে সিমেন্টের চাহিদা মেটানো হতো। নব্বইয়ের দশকে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা সিমেন্ট খাতে বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। একে একে গড়ে উঠতে থাকে অনেক কারখানা। সরকারের অবকাঠামো খাতের মেগা প্রকল্পগুলোর চাহিদা বিবেচনায় গত এক যুগে সিমেন্ট খাতের উদ্যোক্তারা নিজেদের উৎপাদন সক্ষমতাও বাড়িয়েছেন অনেক। পদ্মা সেতু সহ অন্যান্য মেগা প্রকল্পসমূহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট জোগানের মাধ্যমে এ খাতের কোম্পানিগুলোর ভালো ব্যবসা হয়েছে। নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পদ্মা সেতুর মাধ্যমে ২১ জেলার মধ্যে যে সংযোগ তৈরি হয়েছে এর প্রভাবে সিমেন্টের চাহিদা আরো বাড়বে। বর্তমানে বাংলাদেশে সিমেন্টের মোট চাহিদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ছক-৩: বাংলাদেশে সিমেন্টের বাৎসরিক চাহিদা

সাল	চাহিদা (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
২০১২	১৬
২০১৪	১৯
২০১৬	২৩
২০১৮	৩১
২০২০	৩৪
২০২২	৪০

চিত্র-২: বাংলাদেশে সিমেন্টের বাৎসরিক চাহিদা

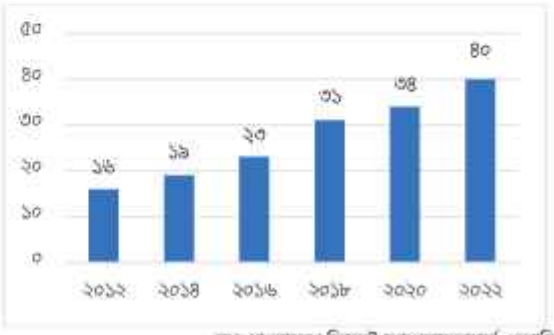

সূত্র: বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন

উপর্যুক্ত ছক ও চিত্রে বিগত দশকে বাংলাদেশে সিমেন্টের মোট চাহিদা দেখানো হয়েছে। ছকে দেখা যায় যে, ২০২২ সালে দেশে সিমেন্টের মোট চাহিদা ছিলো ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। কিন্তু সিমেন্ট কোম্পানিগুলোর মোট উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের জন্য সিমেন্ট কোম্পানিগুলোকে বড় আকারের বিনিয়োগ করতে হয়েছে। এই বিনিয়োগের ফলে সিমেন্ট কোম্পানিগুলোকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন সক্ষমতার জন্য যে সকল ভারী যন্ত্রপাতি ইনস্টল করতে হয়েছে সেগুলো বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে অবচয় হচ্ছে। বড় আকারের ঋনের সুদ, অবচয় ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ফলে সিমেন্টের দাম দিনে দিনে বেড়েই চলছে। তাই বলা যায় অব্যবহৃত উৎপাদন সক্ষমতার কারণে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি এর ফ্যাক্টরি পরিদর্শনকালে উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যার ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি কর্তৃপক্ষ জানান যে, দেশের সিমেন্ট বাজারে বছরের সকল সময়ে চাহিদা একই রূপ থাকেনা। পিক সিজনের সর্বোচ্চ চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে ফ্যাক্টরির উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। অফ সিজনের ন্যূনতম বাজার চাহিদার সাথে সমন্বয় বা গড় করা হলে বাৎসরিক প্রকৃত উৎপাদন সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতার তুলনায় কম হয় বলে তারা দাবী করেন।

৪.৪.১) সিমেন্টের মৌসুমি চাহিদা

পণ্যের মূল্যের উপর প্রভাব ফেলে এমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজারে পণ্যটির মৌসুমী চাহিদা। সিমেন্ট শিল্পে সিমেন্টের চাহিদার দিক থেকে প্রধানত দুইটি প্রভাবশালী ঋতু রয়েছে। সেগুলো হলো:

- পিক সিজন: নভেম্বর থেকে এপ্রিল/মে
- অফ সিজন: জুন থেকে অক্টোবর

সিমেন্ট শিল্পে নভেম্বর থেকে এপ্রিল যা কখনও কখনও মে পর্যন্ত প্রসারিত হয় তাকে পিক সিজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়ে বাজারে সিমেন্টের চাহিদা খুব বেশি থাকে। বাংলাদেশের জলবায়ু অনুসারে এ সময়ে দেশে বৃষ্টিপাত কম বা একদম হয়ইনা। তাই এই মৌসুমে ভবন নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য আদর্শ সময়।

সিমেন্ট শিল্পের অফ সিজন সাধারণত জুন থেকে শুরু হয় এবং অক্টোবরে শেষ হয়। এই সময়ে সিমেন্টের বিক্রি সাধারণত সর্বনিম্ন বা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি থাকে। এটি পিক সিজনের ঠিক আগের সময়। অতীতের পর্যবেক্ষণ থেকে এটি দেখা গেছে যে সাধারণত বছরের এই সময়ে সিমেন্ট সম্পর্কিত অন্যান্য উপকরণ কম পাওয়া যায়।

৪.৫) খাতওয়ারি সিমেন্টের ব্যবহার

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সিডব্লিউ রিসার্চ প্রকাশিত 'বাংলাদেশ সিমেন্ট মার্কেট রিপোর্ট ২০২০' অনুযায়ী, বাংলাদেশে সরকারি অবকাঠামো উন্নয়নে সিমেন্টের ব্যবহার ৩৫ শতাংশ। ব্যক্তি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার ৪০ শতাংশ। আবাসন খাতে তা ২৫ শতাংশ।

কয়েক বছর আগেও ব্যক্তি খাতে সিমেন্টের চাহিদা ছিল মোট বাজারের ৬০ শতাংশ। অন্য খাতে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এখন সেখানকার চাহিদা কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে। এ ছাড়া বর্তমানে সিমেন্টের বাজারের ৩৫ শতাংশ সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ, ১০ শতাংশ শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবন, ১০ শতাংশ আবাসন খাত এবং বাকি ৫ শতাংশ বৈদ্যুতিক খুঁটি ও কংক্রিটের দখলে রয়েছে। সরকারি মেগা প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজে সিমেন্টের চাহিদা যে হারে বেড়েছে, ব্যক্তি খাতে সেভাবে বাড়েনি। বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্পের প্রধান গ্রাহকগণের পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

ছক-৪: সিমেন্টের প্রধান গ্রাহক

স্বতন্ত্র বাড়ি নির্মাণকারী	৪০%
রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার	২৫%
সরকারি প্রতিষ্ঠান- যেমন: এলজিইডি, পিডব্লিউডি, আরএইচডি ইত্যাদি	৩৫%

সূত্র: বাংলাদেশ সিমেন্ট মার্কেট রিপোর্ট ২০২০

৪.৫.১) মেগা প্রকল্প: সিমেন্ট শিল্পের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সরকার বেশকিছু বড় অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নিয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকার এডিপিতে ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছে যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ৯.২০% বেশী। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাজেট বরাদ্দ বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং সিমেন্টের চাহিদার ক্ষেত্রে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সেহেতু অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ আগামী বছরগুলোতে আরো বাড়বে। সিমেন্ট উৎপাদনকারী দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিম্নলিখিত বিভিন্ন মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে সিমেন্ট সরবরাহ করছে:

ছক-৫: দেশের চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ
০১	রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১১৩০৯২	ডিসেম্বর ২০২৫
০২	পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প	৩৪৯৮৮	জুন ২০২৪
০৩	বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু	১৬৭৮১	ডিসেম্বর ২০২৫
০৪	মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর	১৭৭৭৭	ডিসেম্বর ২০২৫
০৫	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	১৬৯০১	জুন ২০২৬

সূত্র: উইকিপিডিয়া

৪.৬) সিমেন্ট রপ্তানি চিত্র

সিমেন্ট শিল্প ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৯.৫৭ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জন করেছে। বাংলাদেশ তার ৯০ শতাংশ সিমেন্ট রপ্তানি করে ভারতে। ভারতে যে পরিমাণ সিমেন্ট রপ্তানি করা হয় তার অধিকাংশই রপ্তানি হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে যেমন: মণিপুর, মেজোরাম, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা। ডলারের বিপরীতে রুপির অবমূল্যায়ন হওয়ায় বিগত ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতে সিমেন্ট রপ্তানি বছরে ২০% কমেছে। তাছাড়া নেপালে সিমেন্ট রপ্তানি করা যাচ্ছে না, কারণ বাংলাবান্ধা থেকে নেপালের কাঁকরভিটা পর্যন্ত যেতে দুই দফা পণ্য ওঠাতে নামাতে হয়। বাংলাদেশের ট্রাক সরাসরি নেপাল যেতে না পারায় পরিবহন খরচ বেড়ে যায়।

ছক-৬: সিমেন্ট রপ্তানি চিত্র

সাল	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন ডলার)
২০১৪-১৫	৪.৬১
২০১৫-১৬	২.২১
২০১৬-১৭	১০.৭৪
২০১৭-১৮	১২.৫৯
২০১৮-১৯	১০.৪১
২০১৯-২০	৯.১৪
২০২০-২১	৭.২৬
২০২১-২২	৯.৫৭

সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চিত্র-৩: সিমেন্ট রপ্তানি ট্রেন্ড

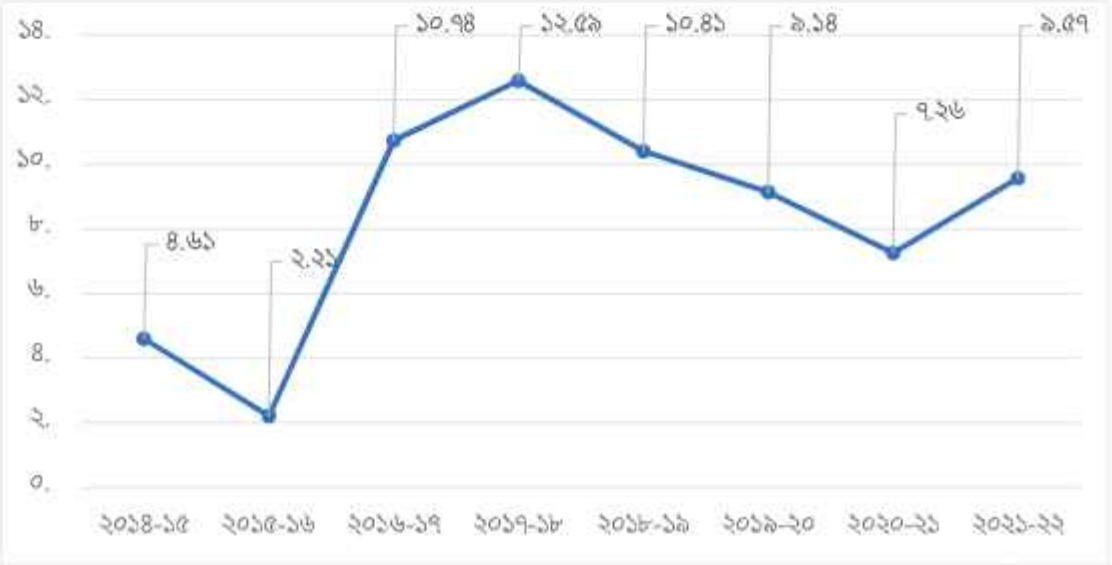

সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, উল্লিখিত বছরগুলোর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে সর্বোচ্চ রপ্তানি করা হয়েছিল। উক্ত বছরে সিমেন্ট রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ১২.৫৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সিমেন্ট রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি কমে গিয়ে ৭.২৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাড়ায়। তবে কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে এই খাতটির রপ্তানি আয় ঘুরে দাড়ানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

৪.৭) সিমেন্টের কাঁচামাল

বর্তমানে বাংলাদেশে দুই ধরনের সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। একটি সাধারণ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (ওপিসি) এবং অন্যটি পোর্টল্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট (পিসিসি)। ওপিসি ফ্লাইওভার কিংবা বহুতল ভবনের মতো নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। পিসিসি সব ধরনের নির্মাণকাজে ব্যবহার করা যায়। বিম এবং কলামে ওপিসি ব্যবহারই যথেষ্ট। বাকিটায় পিসিসি ব্যবহার করা হয়। ওপিসি কিছুটা ব্যয়বহুল। দেশে সিমেন্ট উৎপাদন করে তা রপ্তানি করা হলেও সিমেন্টের কাঁচামাল দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও যেহেতু সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল প্রায় পুরোটাই আমদানি করতে হয় সেহেতু কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার কারণে সিমেন্টের দাম বেড়ে যায়। বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপ, জয়পুরহাট ও সিলেট অঞ্চল থেকে সামান্য পরিমাণে চুনাপাথর সংগ্রহ করা হয়। ফলে সিমেন্টের প্রধান

উপাদান ক্লিংকার উৎপাদনে প্রয়োজনীয় খনিজ চুনাপাথরের চাহিদা দেশীয়ভাবে মেটানো সম্ভব হয় না। মাত্র দুটি কোম্পানিতে তাদের নিজস্ব প্লান্টে ক্লিংকার উৎপাদন সুবিধা রয়েছে: ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেড যেটি একটি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি এবং লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড। লাফার্জ সুরমা বাংলাদেশ বছরে ১.৩ মিলিয়ন টন থেকে ১.৪ মিলিয়ন টন ক্লিংকার উৎপাদন করে যা বাজারের বার্ষিক চাহিদার ৭-৮ শতাংশ। ফলে বড় সিমেন্ট নির্মাতারা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্লিঙ্কার, জিপসাম, ফ্লাই অ্যাশ এবং লোহার স্ল্যাগ বিদেশ থেকে আমদানি করছে এবং গ্রাইন্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিমেন্ট উৎপাদন করছে।

বেশিরভাগ নির্মাতারা ক্লিংকার আমদানি করে ভিয়েতনাম, চীন, হংকং, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে। তবে কিছু নির্মাতারা সিলেট থেকে সংগ্রহ করা স্থানীয় চুনাপাথর ব্যবহার করে। আমদানিকৃত ফ্লাই অ্যাশের বেশিরভাগ অংশই আসে ভারত থেকে। স্ল্যাগ চীন, ভারত, জাপান এবং সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি করা হয়। জিপসাম চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপান থেকে পাওয়া যায়। সমস্ত প্রধান কাঁচামাল যেমন ক্লিঙ্কার, স্ল্যাগ, ফ্লাই অ্যাশ, জিপসাম এবং চুনাপাথরের দাম গত দুই বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৭ সালের শেষের দিকে, চীনা সরকার পরিবেশের ক্ষতি কমাতে ভেজা ভাটা আছে এমন সমন্বিত প্লান্ট থেকে ক্লিঙ্কারের উৎপাদন নিরুৎসাহিত করে। পরবর্তীতে, চীনা নির্মাতারা তার নিকটতম উৎস- ভিয়েতনাম থেকে ক্লিঙ্কার আমদানি শুরু করে। ফলে ক্লিঙ্কারের দাম হঠাৎ করেই বেড়ে যায়।

ছক-৭: কাঁচামাল আমদানির উৎস্য দেশ

ক্রমিক নং	কাঁচামাল	আমদানির উৎস্য দেশ
০১	ক্লিংকার	ভিয়েতনাম, চীন, হংকং, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া
০২	চুনাপাথর	ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত
০৩	জিপসাম	থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপান
০৪	স্ল্যাগ	ভিয়েতনাম, চীন, ভারত, জাপান এবং সিঙ্গাপুর
০৫	ফ্লাই অ্যাশ	ভারত

৪.৭.১) সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানি তথ্য

ছক-৮: বাংলাদেশের সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানি তথ্য

অর্থবছর	লাইমস্টোন (এইচ এস কোড: ২৫২১.০০.১০)				ক্লিংকার (এইচ এস কোড: ২৫২৩.১০.২০)			
	পরিমাণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	মোট মূল্য (কোটি টাকা)	প্রতি টনের মূল্য	মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি (শতকরা হারে)	পরিমাণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	মোট মূল্য (কোটি টাকা)	প্রতি টনের মূল্য	মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি (শতকরা হারে)
২০১৭-২০১৮	২.১৯	৫৬৭.০৩	২৫৮৯.১৭	———	১৫.৮৪	৬৭০৭.২৩	৪২৩৪.৩৬	———
২০১৮-২০১৯	২.৮৩	৭৩৫.৮৩	২৬০০.১০	০.৪%	১৮.৮৭	৮,৩৭৭.১৬	৪৪৩৯.৪০	৪.৮৪%
২০১৯-২০২০	৩.৬৮	৯৫৯.২৫	২৬০৬.৬৫	০.২৫%	১৮.৯৭	৮,৩০৭.৬২	৪৩৭৯.৩৪	১.৩৫%
২০২০-২০২১	৬.৯৬	১,৭১৮.৬৬	২৪৬৯.৩৩	-৫.২৬%	২৩.৬৪	১০০৯১.৭৬	৪২৬৮.৯৩	-২.৫২%
২০২১-২০২২	১০.৯৮	২৮৫৬.৯৫	২৬০১.৯৫	৫.৩৭%	২১.৫৮	১১,৫৫৬.৬২	৫৩৫৫.২৪	২৫.৪৪%

অর্থবছর	জিপসাম (এইচ এস কোড: ২৫২০.১০.৯০)				ফ্লাই অ্যাশ (এইচ এস কোড: ২৬২০.৯৯.১০)			
	পরিমাণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	মোট মূল্য (কোটি টাকা)	প্রতি টনের মূল্য	মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি (শতকরা হারে)	পরিমাণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	মোট মূল্য (কোটি টাকা)	প্রতি টনের মূল্য	মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি (শতকরা হারে)
২০১৭-২০১৮	১.১৩	২৯২.৫৯	২৫৮৯.২৯	———	.৪৯	৯৯.৪০	২০২৮.৫৭	———
২০১৮-২০১৯	১.৩৪	৩৫৫.৩০	২৬৫১.৪৯	২.৪০%	.৬৮	১৪৮.৮৫	২১৮৮.৯৭	৭.৯০%
২০১৯-২০২০	১.২৫	৩৩৪.১২	২৬৭২.৯৬	০.৮০%	১.৬৪	৩৮৫.৭১	২৩৫১.৮৯	৭.৪৪%
২০২০-২০২১	১.৬৭	৪৬০.৩৭	২৭৫৬.৭০	৩.১৩%	৪.৬১	১,০০৫.৮৪	২১৮১.৮৬	-৭.২২%
২০২১-২০২২	১.৪২	৪৮৭.১৫	৩৪৩০.৬৩	২৪.৪৪%	৪.৫৭	১,০৭৬.০৭	২৩৫৪.৬৩	৭.৯১%

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কাঁচামাল আমদানি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচামাল আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে- যেমন: ২০২১-২২ অর্থবছরে লাইমস্টোন, ক্লিংকার, জিপসাম ও ফ্লাই অ্যাশের আমদানি ব্যয় যথাক্রমে ৫.৩৭%, ২৫.৪৪%, ২৪.৪৪% ও ৭.৯১% বেড়েছে।

৪.৭.২) প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদনে কাঁচামালের ব্যবহার

চিত্র-৪: প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদনে কাঁচামালের ব্যবহার

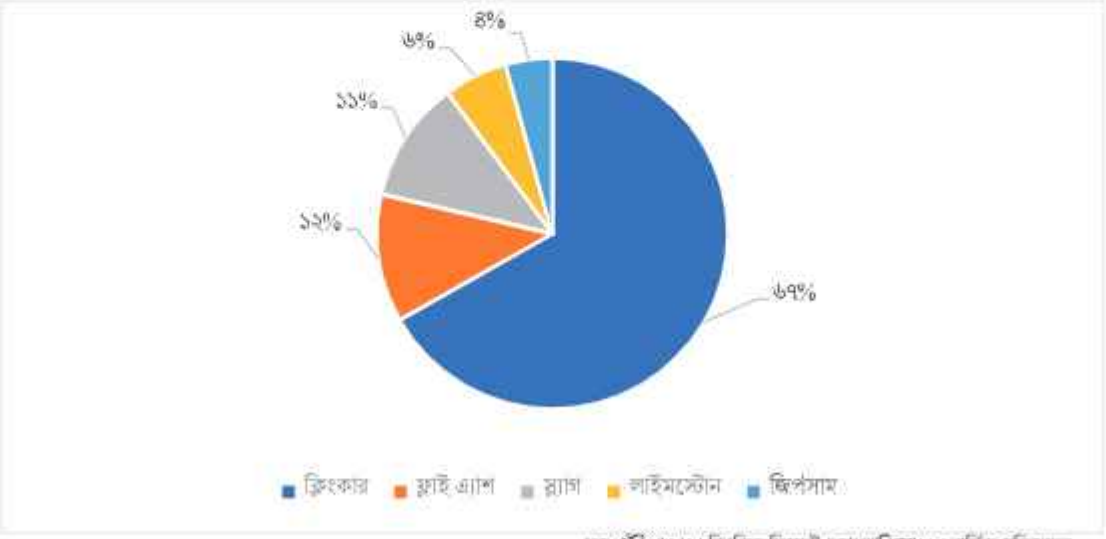

সূত্র: পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত সিমেন্ট কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন

উপর্যুক্ত পাই চার্টে প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিত্র হতে দেখা যায় যে, প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্টে প্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্যে প্রায় ৬৭% ক্লিংকার। এছাড়া ফ্লাই অ্যাশ, স্লাগ, লাইমস্টোন ও জিপসামের পরিমাণ যথাক্রমে ১২%, ৬% ও ৪%।

৪.৮) সিমেন্টের উৎপাদন ব্যয় কাঠামো

সিমেন্ট শিল্পের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য এই শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যয় সম্পর্কে ধারণা নেয়া জরুরি। ব্যয় খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঁচামাল আমদানির ব্যয়, উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যয় এবং ওভারহেড ব্যয় সমন্বিত অন্যান্য নির্দিষ্ট ব্যয়সহ প্যাকেজিংয়ের ব্যয়। সিমেন্ট ব্যাগের মূল্য নির্ধারণের জন্য বেশ কিছু মূল্য উপাদান রয়েছে যা বিবেচনায় নেওয়া হয়। সিমেন্ট উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত চারটি প্রধান ব্যয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ছক-৯: সিমেন্ট উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত চারটি প্রধান ব্যয়

খরচ উপাদান	শতকরা হার
কাঁচামাল	৭৫%
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১০%
পরিবহন	৫%
অন্যান্য	১০%

সূত্র: পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত সিমেন্ট কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন

৪.৯) সিমেন্ট শিল্পে কর কাঠামো

সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকার, স্লাগ, লাইমস্টোন, ফ্লাই অ্যাশ ও জিপসাম। এই পাঁচ রকমের কাঁচামালই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সিমেন্ট উৎপাদনের মূল কাঁচামাল ক্লিংকার প্রতি টন আমদানির বিপরীতে ৫০০ টাকা আমদানি শুল্ক প্রদান করতে

হয়। ক্লিংকার, জিপসাম, ফ্ল্যাই অ্যাশ, স্লাগ ও লাইমস্টোন আমদানিতে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর ও ৩ শতাংশ অগ্রিম কর দিতে হয়।

ছক-১০: সিমেন্ট শিল্পের কর কাঠামো

ধরন	জিপসাম	স্লাগ	ফ্ল্যাই অ্যাশ	লাইমস্টোন	ক্লিংকার
আমদানি শুল্ক	৫%	৫%	৩%	৫%	প্রতি টন ৫০০ টাকা
রেগুলেটরী শুল্ক	০%	০%	৫%	০%	০%
সম্পূরক শুল্ক	০%	০%	০%	০%	০%
ভ্যাট	১৫%	১৫%	১৫%	১৫%	১৫%
আয়কর	৫%	৩%	৩%	৩%	২%
অগ্রিম কর	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৪.১০) বিশ্বব্যাপী সিমেন্ট বাজারের তুলনায় বাংলাদেশের বাজারের অবস্থান

সিমেন্ট মার্কেট রিসার্চ এর ২০২১-২০২৮ সালের প্রাক্কলন অনুসারে, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী সিমেন্ট বাজারের আকার ছিল প্রায় ৩১৪ (৩১৩.৬০) বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৮ সালের মধ্যে ৪৫৫ (৪৫৪.৬৪) বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পূর্বাভাসের সময়কালে CAGR ধরা হয়েছে ৫.১%। ভিয়েতনাম বর্তমানে সিমেন্টের বৃহত্তম রপ্তানিকারক। বিশ্ব বাজারে ওয়ার্ল্ড টপ এক্সপোর্ট অনুসারে ভিয়েতনামের ২০২০ সালে মোট রপ্তানি ছিল ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শীর্ষ রপ্তানিকারকদের তালিকায় তুরস্ক, থাইল্যান্ড, জার্মানি এবং কানাডার মতো দেশও রয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে সিমেন্ট, লবণ ও পাথর খাতের রপ্তানি ছিল ১২.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে কমে ৯.৫৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আইডিএলসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ সিমেন্ট ভারতে রপ্তানি হয়।

চিত্র-৫: বিশ্বব্যাপী সিমেন্টের বাজারের আকার

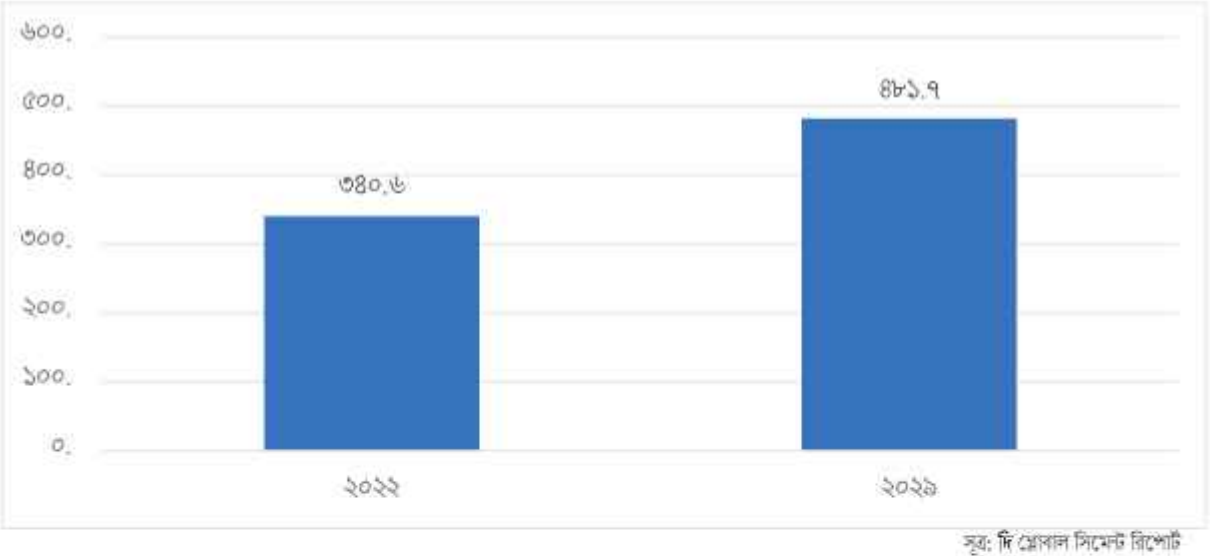

সূত্র: দি গ্লোবাল সিমেন্ট রিপোর্ট

ছক-১১: বিশ্বে শীর্ষ ৫ (পাঁচ) টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী দেশ

শীর্ষ ৫ টি উৎপাদনকারী দেশ	মিলিয়ন মেট্রিক টন (বছর)
চায়না	১,৪০০
ভারত	২৬০
জাপান	৮৪

ইউএসএ	৬৮
রাশিয়া	৫৩

সূত্র: দি গ্লোবাল সিমেন্ট রিপোর্ট

নির্মাণ উপকরণ হিসেবে সিমেন্ট ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই উন্নীত হচ্ছে। বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বের ৪০তম। দুই বছরের ব্যবধানে তিন ধাপ এগিয়ে এ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিমেন্ট খাতের পোর্টাল সেমনেট ডটকম প্রকাশিত 'গ্লোবাল সিমেন্ট রিপোর্ট'-এর সর্বশেষ সংস্করণে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি দুই বছর পরপর বিশ্বের সিমেন্ট খাতের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এ সমীক্ষা প্রকাশ করে তারা। ওই প্রকাশনায় বলা হয়, দেশভিত্তিক সিমেন্ট ব্যবহারে শীর্ষে রয়েছে চীন। এরপরের অবস্থান ভারতের।

৪.১১) তুলনামূলক বার্ষিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গত দুই দশকে মাথাপিছু বার্ষিক সিমেন্টের ব্যবহার ৪৫ কেজি থেকে বেড়ে ২০০ কেজি হয়েছে। তবে সরকারি বৃহৎ প্রকল্পগুলির কাজ চলমান থাকায় সিমেন্ট শিল্পের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

ছক-১২: তুলনামূলক বার্ষিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার

দেশ	২০২২ সালে মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার (কেজি)
চীন	১৭০০
দক্ষিণ কোরিয়া	১২৫০
মালয়েশিয়া	৮০০
থাইল্যান্ড	৫০০
ইন্ডিয়া	৩১২
মায়ানমার	২৭০
বাংলাদেশ	২০০
বৈশ্বিক গড়	৫৬৩

চিত্র-৬: বার্ষিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার

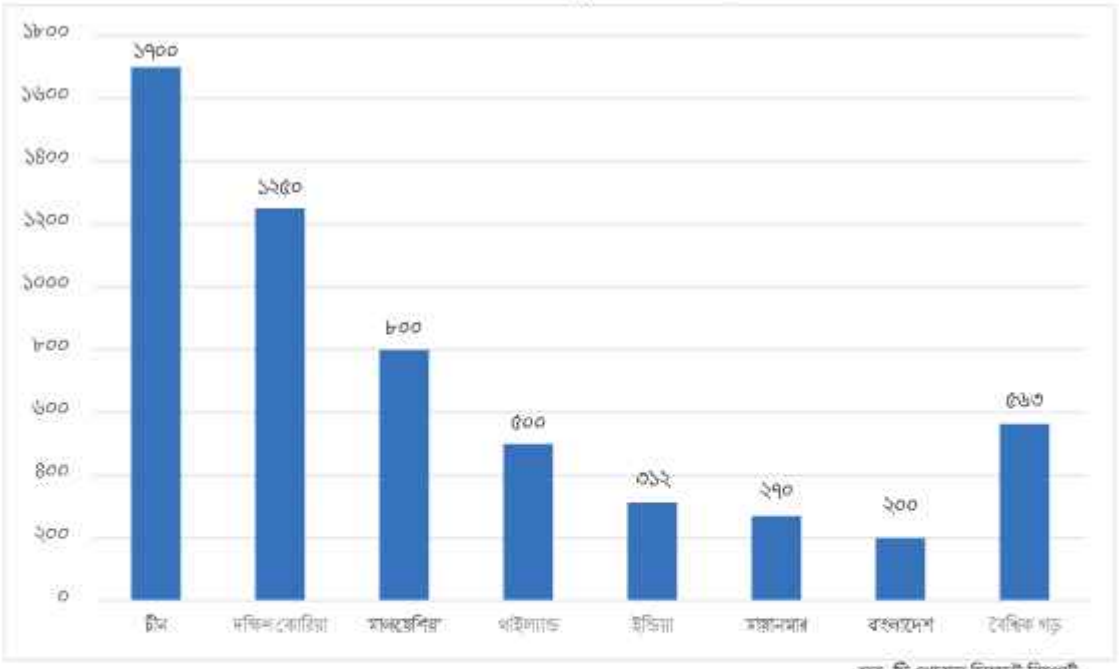

সূত্র: দি গ্লোবাল সিমেন্ট রিপোর্ট

মাথাপিছু সিমেন্ট ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্রটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ মাথাপিছু সিমেন্ট ব্যবহারকারী দেশ হলো চীন, চীনের বাৎসরিক মাথাপিছু সিমেন্ট ব্যবহার হলো ১৭০০ কেজি। এর পরেই রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশে বাৎসরিক মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার ২০০ কেজি যা বৈশ্বিক গড় ৫৬৩ কেজি থেকে অনেক কম। তবে ইতিবাচক বিষয় হলো মাথাপিছু সিমেন্ট ব্যবহার কম বিধায় ভবিষ্যতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.১২) সিমেন্টের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain)

সিমেন্টের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chin) ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র-৭: সরবরাহ শৃঙ্খলের ফ্লো-চার্ট

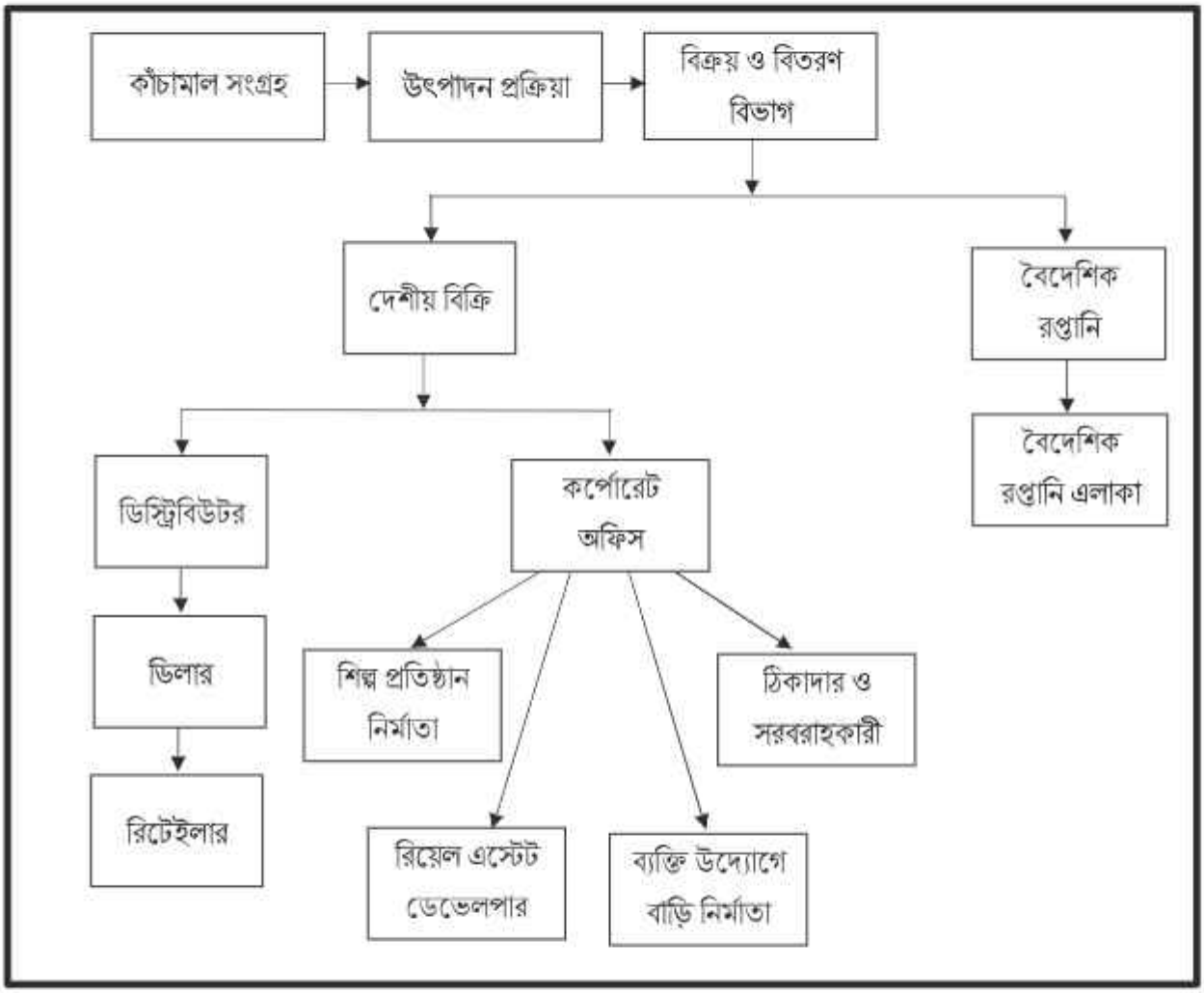

বাংলাদেশের সিমেন্টের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) এর প্রথম ধাপে রয়েছে কাঁচামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া। সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সিংহভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ সংগৃহীত কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজস্ব প্লান্টে সিমেন্ট উৎপাদন করে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে দেশীয় বিক্রি ও বৈদেশিক রপ্তানি এই দুইভাগে ভাগ হয়ে সিমেন্ট প্রান্তিক ব্যবহারকারীর কাছে পৌছে। দেশীয় বিক্রির ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলার ও রিটেইলারদের মাধ্যমে প্রান্তিক ভোক্তার কাছে পৌছে। এছাড়া কর্পোরেট অফিস থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাতা, রিয়েল স্টেট ডেভেলপার, ব্যক্তি উদ্যোগে বাড়ি নির্মাতা এবং ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের কাছে সিমেন্ট বিক্রি করা হয়।

অধ্যায়-৫: সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রোফাইল বিশ্লেষণ

৫.১) সিমেন্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া

সিমেন্ট উৎপাদন করতে কাঁচামাল হিসেবে প্রাথমিক ধাপে ব্যবহার করা হয় চুনাপাথর (লাইমস্টোন) এবং মাটি। এগুলোকে প্রথমে চূর্ণ করা হয়, তারপর ঢুকানো হয় বিশাল আকৃতির সিলিন্ডারের ভেতর। সেখানে ১৪০০-১৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মিশ্রণটিকে উত্তপ্ত করা হয় যাকে বলা হয় ক্যালসিনেশন। উচ্চ তাপমাত্রায় উপাদানগুলো ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় ক্লিংকার। ক্লিঙ্কার ঠান্ডা করে মেশানো হয় জিপসাম ও চুনাপাথর। সঙ্গে আনুপাতিক হারে মেশানো হয় লোহার আকরিক অথবা ছাই যেগুলো স্ল্যাগ এবং ফ্লাইঅ্যাশ নামে বেশি পরিচিত। এরপর মিশ্রণটিকে একটি বলমিলের ভিতরে চূর্ণ করে তৈরি হয় সিমেন্ট। ভাটা সিস্টেমে প্রবেশের আগে কাঁচামাল যেভাবে প্রস্তুত করা হয় তার উপর নির্ভর করে দুটি মৌলিক ধরণের ক্লিঙ্কার উৎপাদন প্রক্রিয়া বিদ্যমান:

১। ভেজা পদ্ধতি ।

২। শুকনো পদ্ধতি ।

প্রক্রিয়া ২টির মধ্যে কোনটি অনুসরণ করা হবে তা নির্ভর করে আর্দ্রতার উপর। যখন ভেজা কাঁচামাল (২০% এর বেশি আর্দ্রতা) পাওয়া যায়, তখন ভেজা প্রক্রিয়াটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইউরোপে নতুন সিমেন্ট প্ল্যান্টগুলি শুষ্ক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কারণ ভেজা প্রক্রিয়ার জন্য প্রায় ৫৬% থেকে ৬৬% বেশি শক্তি প্রয়োজন। শুষ্ক প্রক্রিয়ার জন্য, বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হল মাল্টিস্টেজ সাইক্লোন প্রিহিটার এবং প্রিক্যালসিনার সহ ভাটা সিস্টেম।

৫.২) সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শুধুমাত্র এক ধরনের সিমেন্ট পাওয়া যেত তা হল অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (OPC)। যা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি (ASM) অনুসরণ করে তৈরি করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সিমেন্ট পাওয়া যায় যা সিমেন্ট শিল্পকে গ্রাহকদের আলাদা ও উন্নত পণ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করে। ২০০৩ সাল থেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সিমেন্ট হল পোর্টল্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট (PCC) যা ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি (ESM) অনুসরণ করে তৈরি করা হয়। হোলসিম (ব্ল্যাক সিমেন্ট) প্রথম কোম্পানি যারা এই ধরনের সিমেন্ট বাজারে নিয়ে আসে। বর্তমানে PCC এবং OPC উৎপাদনের অনুপাত ৯৫:৫। PCC ওপিসির মত সমান শক্তি এবং স্থায়িত্ব দেয়। তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল উৎপাদন প্রযুক্তি। PCC তৈরি করতে মাত্র ৬৫%-৮০% ক্লিঙ্কারের প্রয়োজন হয় যেখানে OPC তৈরি করতে ৯৫% ক্লিঙ্কারের প্রয়োজন হয়। তাই বিশ্বব্যাপী পিসিসি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যা উৎপাদনে কম ক্লিঙ্কার প্রয়োজন।

৫.৩) বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানা সমূহ

বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানার তালিকা করলে সেটা অনেক দীর্ঘ হবে। কিন্তু বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ সিমেন্ট কারখানা কারখানা আছে মাত্র দু'টি। ১) ছাতক সিমেন্ট ও ২) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট। অন্যান্য সিমেন্ট কারখানা গুলো বিদেশ থেকে ক্লিঙ্কার গ্রাইন্ডিং মিলে গুড়ো করে সিমেন্ট তৈরি করে সাইলোতে জমা করে এবং সব শেষে প্যাকেটজাত করে।

সিমেন্ট উৎপাদনকারী শীর্ষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- শাহ সিমেন্ট
- আকিজ সিমেন্ট
- হোলসিম সিমেন্ট
- সেভেন রিংস সিমেন্ট
- ক্রাউন সিমেন্ট
- বসুন্ধরা সিমেন্ট
- ফ্রেস সিমেন্ট

- প্রিমিয়ার সিমেন্ট
- আমান সিমেন্ট
- হাইডেলবার্গ সিমেন্ট

৫.৪) উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে শীর্ষ সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

৫.৪.১) শাহ সিমেন্ট

শাহ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত একটি সিমেন্ট প্রস্তুতকারী সংস্থা। এটি উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম সিমেন্ট প্ল্যান্ট। এটি আবুল খায়ের গ্রুপের একটি সহপ্রতিষ্ঠান।

শাহ সিমেন্ট ২০০২ সালে ঢাকার মুন্সীগঞ্জে আবুল খায়ের গ্রুপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রতি বছর ৫.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এটি ১৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে। ২০১৮ সালে, প্রতিষ্ঠানটি দৈনিক ১৫,০০০ টন ক্ষমতার একটি রোলার মিল স্থাপন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাড়ায় ১০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

৫.৪.২) ক্রাউন সিমেন্ট

এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লি. একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪-এ "ক্রাউন সিমেন্ট" ব্র্যান্ড নামে যাত্রা শুরু করে। এটি মুন্সীগঞ্জের পশ্চিম মুক্তারপুরে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। কোম্পানিটি ২০১১ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সাথে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে, পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের ৬০০ মেট্রিক টন/দিন উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্লান্ট ইনস্টল করা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে ক্রাউন সিমেন্টের চাহিদা বেড়েই চলেছে। ২০০২ সালে ক্রাউন সিমেন্টের ২য় ইউনিট চালু করা হয় এবং এর ফলে কোম্পানিটির উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাড়ায় দিনে ৮০০ মেট্রিক টন। এভাবে ২০০৮, ২০১১ এবং ২০১৭ সালে যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ইউনিট চালু করা হয়। ফলে ক্রাউন সিমেন্টের উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাড়ায় দৈনিক ১১০০০ মেট্রিক টন। বাৎসরিকভাবে ৭.০৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

৫.৪.৩) বসুন্ধরা সিমেন্ট

বসুন্ধরা সিমেন্ট হল বাংলাদেশের একটি অন্যতম শিল্প সংস্থা বসুন্ধরা গ্রুপের (Bashundhara Industrial Complex Ltd (BICL) একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠানের দু'টি সিমেন্ট কারখানা আছে । একটি হচ্ছে খুলনার মংলায়। এই কারখানার সিমেন্টের ব্র্যান্ড "King Brand Cement"। এটি প্রথম উৎপাদন শুরু করে ২০১২ সালে। অপর কারখানাটি হচ্ছে নারায়নগঞ্জের মাদানগঞ্জে। বর্তমানে বসুন্ধরা গ্রুপের উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছর ৭.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

৫.৪.৪) হোলসিম বাংলাদেশ

হোন্দাই সিমেন্ট বাংলাদেশ ক্রয়ের মাধ্যমে ২০০০ সালে হোলসিম বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তিতে তারা আরও দু'টি সিমেন্ট কারখানা (১) ইউনাইটেড সিমেন্ট, মেঘনা ঘাট (২) সাইহাম সিমেন্ট, মংলা ক্রয় করে এবং তাদের বাজার বিস্তার করে। Lafarge Holcim Bangladesh Ltd. (LHBL) বাংলাদেশের একটি ফ্রন্টলাইন সিমেন্ট উৎপাদনকারী। প্রায় দুই দশক ধরে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান তিনটি গ্রাইন্ডিং প্ল্যান্ট নির্মাণে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই খাতে সবচেয়ে বড় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ এটি। এটি Holcim এবং Cementos Molins এর যৌথ উদ্যোগ।

ভারতের প্রতিবেশী মেঘালয়ে নিজস্ব কোয়ারি থেকে চুনাপাথর ও মৌলিক কাঁচামাল সংগ্রহ করে পরিচালিত উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের সিলেটের কাছে ছাতকের প্ল্যান্টটি একটি অনন্য আন্তঃসীমান্ত অপারেশন এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একটি ১৭ কিলোমিটার ওভারল্যান্ড দীর্ঘ বেল্ট পরিবাহক দ্বারা চুনাপাথর আনা হয় যা কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করে। ক্লিংকার উৎপাদন করে এই প্ল্যান্টটি দেশের বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রায় প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় করছে। এছাড়া কোম্পানিটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিন হাজারের বেশি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এ কোম্পানিটি তাদের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর সরাসরি ভারত থেকে কনভেয়ার বেল্ট-এর মাধ্যমে আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ কোম্পানি তাদের সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য ক্লিঙ্কার নামক উপাদানটি ছাতক লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে নদী ও স্থল পথে ক্রয় করে থাকে ।

৫.৪.৫) আমান সিমেন্ট

আমান সিমেন্ট মিলস লিমিটেড আমান গ্রুপের একটি উদ্যোগ। ২০১১ সালে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সিমেন্ট তৈরি শুরু করে। প্রাথমিকভাবে কোম্পানিটি আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এ প্রতিদিন ৫০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ভিআরএম সিমেন্ট উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়। পরবর্তীতে কোম্পানিটি ভিআরএম মিল স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিদিন মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১০০০০ মেট্রিক টন এ উন্নিত করে।

৫.৪.৬) ফ্রেশ সিমেন্ট

মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশের শীর্ষ তিনটি সিমেন্ট উৎপাদক এবং বিপণনকারীর মধ্যে একটি। এটি ফ্রেশ এবং মেঘনাসেম ভিলাক্স নামে দুটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করে। গ্রুপটি ২০০২ সালে তার সিমেন্ট উৎপাদন ব্যবসা শুরু করে। তারপর থেকে, কোম্পানিটি ক্রমাগত ক্ষমতা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করছে এবং পরিবর্তিত ভোক্তা চাহিদা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সর্বশেষ প্রযুক্তি গ্রহণ করছে।

৫.৪.৭) সেভেন রিংস সিমেন্ট

১৯৯৯ সালে সেভেন সার্কেল বাংলাদেশ লিমিটেড সেভেন রিংস সিমেন্ট ব্র্যান্ড নামে সিমেন্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণমান, আধুনিক উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি এবং দূরদর্শী ব্যবস্থাপনা কোম্পানিটিকে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সিমেন্ট ব্র্যান্ড হিসেবে স্থান দিয়েছে।

সেভেন রিংস সিমেন্টের প্রথম কারখানাটি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে সেভেন সার্কেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এসসিবিএল) নামে স্থাপিত হয়েছিল। যা ঢাকা শহর থেকে মাত্র ৩৮ কিলোমিটার দূরে। বর্তমান এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সেভেন রিং সিমেন্টের দ্বিতীয় কারখানাটি ২০১৪ সালে খুলনার কেডিএ শিল্প এলাকার লবনচড়ায় রূপসা নদীর তীরে শুন শিং সিমেন্ট মিলস লিমিটেড (এসএসসিএমএল) নামে স্থাপিত হয়েছিল। যা খুলনা সিটি সেন্টার থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেটির বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন ।

৫.৪.৮) প্রিমিয়ার সিমেন্ট

প্রিমিয়ার সিমেন্ট একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ১৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে "প্রিমিয়ার সিমেন্ট" ব্র্যান্ড নামে যাত্রা শুরু করে।

প্রাথমিকভাবে প্ল্যান্টটি বার্ষিক ০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সহ স্থাপন করা হয়েছিল। ২য় ইউনিটটি ২০১১ সালে বার্ষিক ০.৬ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতা সহ শুরু হয়েছিল; ৩য় ইউনিট এবং ৪র্থ ইউনিট প্রতি বছর ০.৬ মিলিয়ন টন ক্ষমতা সহ ২০১৩ সালে উৎপাদন শুরু করে। এখন তাদের বার্ষিক ২.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। ২০১৭ সালে, কোম্পানিটি এফএল স্মিথ-ডেনমার্কের সাথে ভার্টিক্যাল রোলার মিল স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৫.১৬ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পাবে।

এটিকে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে ২০১০ সালে ৫,০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন সহ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। তিন বছর পরিচালনা ও উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর ২০১৩ সালে এটি একযোগে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সাথে তালিকাভুক্ত হয়।

৫.৪.৯) হাইডেলবার্গ সিমেন্ট (স্ক্যান সিমেন্ট)

হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ আন্তর্জাতিক সিমেন্ট কোম্পানি হাইডেলবার্গ সিমেন্ট গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ এর কারখানা দুটি হলো:

১) চট্টগ্রাম সিমেন্ট ক্লিঙ্কার গ্রাইনডিং কোম্পানি লিঃ যার ব্র্যান্ড হচ্ছে রুবি ।
২) স্ক্যান সিমেন্ট লিঃ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

এই দু'টি কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২.৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

৫.৪.১০) ছাতক সিমেন্ট

ছাতক সিমেন্ট বা ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের প্রথম এবং সবচেয়ে পুরাতন সিমেন্ট কারখানা, যা সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৭ সালে আসামবেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানি নামে এ সিমেন্ট কারখানাটি স্থাপিত হয়। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মে.টন। এর কাঁচামাল চুনাপাথর ভারতের মেঘালয় থেকে আমদানি করা হয় এছাড়া টেকেরঘাট-এর নিজস্ব পাথর উত্তোলন কেন্দ্র থেকেও পাথর সংগ্রহ করা হয়। ছাতক সিমেন্ট আসামে রফতানি করা হয়।

কারখানাটি আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এরই মধ্যে ৮৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির ৭৫ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। কারখানাটি চালু হলে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার টন ক্লিংকার ও সিমেন্ট উৎপাদন হবে। এতে দেড় যুগ ধরে লোকসানে থাকা প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৫.৪.১১) আকিজ সিমেন্ট

আকিজ গ্রুপ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো শিল্প সংস্থা গুলোর মধ্যে অন্যতম যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৩ সাল। নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত আকিজ সিমেন্ট কারখানা প্রথম ২০০২ সালের ৩রা নভেম্বরে উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা ১.২ লক্ষ মেট্রিক টন। আকিজ সিমেন্ট বাংলাদেশে প্রথম "Vertical Roller Mill (VRM) প্রযুক্তি ব্যাবহার করে সিমেন্ট উৎপাদন করে।

৫.৫) পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত সিমেন্ট কোম্পানিসমূহ

দেশের মোট ৩৫টি সিমেন্ট কোম্পানির মধ্যে ৭টি কোম্পানি পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত। এগুলো হলো:

- লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট
- ক্রাউন সিমেন্ট
- কনফিডেন্স সিমেন্ট
- প্রিমিয়ার সিমেন্ট
- মেঘনা সিমেন্ট
- হাইডেলবার্গ সিমেন্ট
- আরামিট সিমেন্ট

৫.৬) বাংলাদেশে সিমেন্ট খাতে বিদেশি কোম্পানি

বর্তমানে বাংলাদেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারী মোট ৩৫টি কোম্পানি রয়েছে। যার মধ্যে ৩১টি দেশি কোম্পানি এবং বাকি ৪টি বিদেশি। বিদেশি ৪টি কোম্পানি হলো:

ছক-১৩: বাংলাদেশে সিমেন্ট খাতে বিদেশি কোম্পানি

কোম্পানি	ভিত্তি দেশ
সেভেন রিংস সিমেন্ট	হংকং ভিত্তিক
হাইডেলবার্গ সিমেন্ট	জার্মান
লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট	সুইজারল্যান্ড
ইনসি সিমেন্ট	থাইল্যান্ড

৫.৭) কোম্পানিভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা

ছক-১৪: কোম্পানিভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা

সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানি	প্রোমোটার	সক্ষমতা (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
শাহ সিমেন্ট	আবুল খাঁয়ের গ্রুপ	১০.৬৬
ক্রাউন সিমেন্ট	এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লিমিটেড	৭.০৮
বসুন্ধরা সিমেন্ট	বসুন্ধরা গ্রুপ	৫.০৫
লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট	লাফার্জ হোলসিম এন্ড সিমেন্টোস মলিনস	৪.৭
আমান সিমেন্ট	আমান গ্রুপ	৩.৭৬
ফ্রেস সিমেন্ট	মেঘনা গ্রুপ	৩.৬
সেভেন রিংস সিমেন্ট	সান শাইন গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	৩.৫
প্রিমিয়ার সিমেন্ট	প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিঃ	২.৮৫
হাইডেলবার্গ সিমেন্ট (স্ক্যান ও রুবি)	HC Netherlands Holding B.V (39.8), HC Asia Holding GmbH, Germany (20.86%)	২.৮৫
আকিজ সিমেন্ট	আকিজ গ্রুপ	১.২

সূত্র: বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, কোম্পানিসমূহের ওয়েবসাইট ও বার্ষিক প্রতিবেদন

উপর্যুক্ত ছকে শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট কোম্পানির বাৎসরিক উৎপাদন সক্ষমতা তুলে ধরা হয়েছে।

৫.৮) সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের এ্যাসোসিয়েশন

বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ) বাংলাদেশের পোর্টল্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট (পিসিসি) এবং অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (ওপিসি) প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের একটি সমিতি। এই সমিতির নিবন্ধন নং সি-৪৩৩ (১০)/১৯৯৮ এবং এটি ১৯৯৮ সালে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই সমিতির টি.ও লাইসেন্স নং ২৬/৯৮। বর্তমানে ৩১ টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানি বিসিএমএ এর সদস্য যা সভাপতির নেতৃত্বে ১০ সদস্যের নির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্বাহী পরিচালক সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। বিসিএমএ ম্যাবস এন্ড জে পার্টনারস দ্বারা নিরীক্ষিত হয়।

৫.৯) সিমেন্টের মূল্য সূচক

ছক-১৫: সিমেন্টের মূল্য সূচক

(ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬=১০০)

(ওয়েট: ৩.৫৭)

সাল	মূল্য সূচক
২০১১-১২	১০৪.২৬
২০১২-১৩	১১৬.০৯
২০১৩-১৪	১২১.৯৬
২০১৪-১৫	১২৭.৭৪
২০১৫-১৬	১২৭.১৯
২০১৭-১৮	১২৭.১৯
২০১৮-১৯	১২৭.৪০
২০১৯-২০	১৩০.৫৩
২০২০-২১	১৩৩.৩৪
২০২১-২২	১৩৭.৮১
২০২২-২৩ (মে' ২০২৩)	১৪৪.২৫

চিত্র-৮: সিমেন্টের মূল্য সূচক

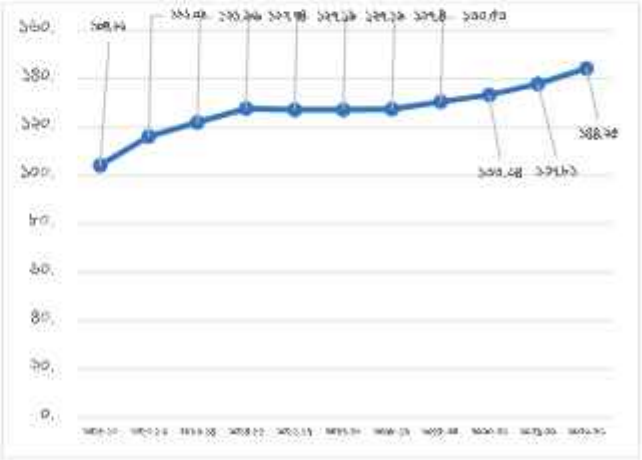

সূত্র: bbs.gov.bd

উপর্যুক্ত ছকে সিমেন্টের মূল্য সূচক তুলে ধরা হয়েছে। এই সূচকের ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ থেকে এই সূচক সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ এখনো প্রকাশিত না হওয়ায় সিমেন্টের বাজার মূল্য থেকে উক্ত ২ বছরের সূচক নির্ণয় করা হয়েছে। সূচকের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে সূচকটি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিবেচ্য বছরগুলিতে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সিমেন্টের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে বলে প্রতীয়মাণ হয়। উল্লেখ্য, মুদ্রার বিনিময় হার বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৫০ কেজির প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের মূল্য ৪২০-৫৫০ টাকা।

৫.১০) সিমেন্ট শিল্পে মার্জার ও এ্যাকুইজিশন

গত ১ দশকে বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পে ২টি মার্জার ও এ্যাকুইজিশন সম্পন্ন হয়েছে। এগুলো হলো-

(১) হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১৯ সালে এমিরেটস সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড ও এমিরেটস পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডকে ১৮৩ কোটি টাকার বিনিময়ে অধিগ্রহণ করেছে। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২২৮ ও ২২৯ ধারার অধীনে উচ্চ আদালত থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে এই অধিগ্রহণ করা হয়।

(২) সুইজারল্যান্ডভিত্তিক হোলসিম ও ফ্রান্সভিত্তিক লাফার্জ ২০১৯ সালের ২১ জুলাই হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন নিয়ে একীভূত হয়। লাফার্জ সিমেন্ট প্রায় ৫০৫ কোটি টাকায় হোলসিম লিমিটেডের সকল শেয়ার কিনে নেয়।

অধ্যায়-৬: বাংলাদেশের সিমেন্টের বাজার কাঠামো

৬.১) সিমেন্টের বাজার কাঠামো (Market Structure) পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সিমেন্টের বাজার কাঠামো বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত গাণিতিক ফর্মুলা (Mathematical Formula) ব্যবহৃত হয়েছে:

মার্কেট শেয়ার (Market Share)

ক) উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে,

$$\text{মার্কেট শেয়ার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎপাদন সক্ষমতা}}{\text{মোট বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা}} \times ১০০$$

বাজার কাঠামো (Market Structure)

উইকিপিডিয়া হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, কোন মার্কেটে বিদ্যমান ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার উপর মার্কেটকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

ছক-১৬: ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার ভিত্তিতে বাজারের গঠন প্রকারভেদ

কর্তৃত্বময় অবস্থানে থাকা ক্রেতা/ বিক্রেতা	১টি	২টি	২টি বা ততোধিক
বিক্রেতা	মনোপলি	ডুয়োপলি	ওলিগোপলি
ক্রেতা	মনোপসনি	ডুয়োপসনি	ওলিগপসনি

CR4 (4-Firm Concentration Ratio)

একটি মার্কেটের শীর্ষ ৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফলকেই CR4 বা 4-Firm Concentration Ratio বলা হয়। এটি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি দ্বারা মূলত বোঝা যায় কোন মার্কেট।

ক) অল্প সংখ্যক বড় প্রতিষ্ঠান দিয়ে গঠিত; অথবা

খ) অধিক সংখ্যক ছোট প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত

CR4 নির্ণয়ের সূত্র, $CR4 = C1 + C2 + C3 + C4$;

এখানে, Ci = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং $i = 1, 2, 3, 4$।

উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা কোন মার্কেটের Concentration এর মাত্রা সম্পর্কে নিম্নের ছক-১৭ এ উল্লিখিত সীমা অনুসরণ করতে পারিঃ

ছক-১৭: মার্কেটের concentration এর মাত্রা সম্পর্কে উল্লিখিত সীমা

CR4	Market Concentration	Degree Of Competition	Comments
০%	No Concentration	Perfect Competition	মার্কেটে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার সমান।
০% থেকে ৪০%	Low Concentration	Fair Competition to Monopolistic Competition	০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত হলে বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বলা যাবে। ০% এর কাছাকাছি হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং ৪০% এর কাছাকাছি হলে মনোপলিস্টিক প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ মার্কেটে বেশি সংখ্যক কম মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।

৪০% থেকে ৭০%	Moderate Concentration	Likely Oligopolistic Market To Oligopoly Market	৪০% থেকে ৭০% সীমার অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত মার্কেটে ওলিগোপলিস্টিক প্রতিযোগিতা বা সম্ভাব্য ওলিগোপলি বিদ্যমান বলা যায় অর্থাৎ মার্কেটে অল্প সংখ্যক অধিক শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
৭০% থেকে ১০০%	High Concentration	Oligopoly Market to Monopoly	মনোপলি অথবা ওলিগোপলি; মার্কেটে একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারই যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার মনোপলি; মার্কেটের দুইটি (ডুয়োপলি) বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফল যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার ওলিগোপলি।

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

কোন সক্রিয় মার্কেটের শীর্ষ ৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গকে যোগ করে যোগফলকে HHI (Herfindahl-Hirschman Index) বলা হয়। এটি দ্বারাও কোন মার্কেটের concentration level সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি CR4 এর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য কারণ বর্গের যোগফল হওয়ার কারণে এটি একটি Standard weighted পরিমাপ। অর্থাৎ বড় মার্কেট শেয়ারে বেশি প্রাধান্য (weight) এবং ছোট মার্কেট শেয়ারে তুলনামূলক কম প্রাধান্য (weight) প্রদান করায় এটি আনুপাতিক পরিমাপ হিসেবে অধিক প্রযোজ্য। HHI নির্ণয়ের সূত্র,

$$HHI = C1 + C2 + C3 + \cdots\cdots\cdots\cdots, +Cn$$

এখানে, Ci = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং i= 1, 2, 3, ……, n।

ছক-১৮: HHI এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা

HHI এর মান	Concentration level
১৫০০ বা ১৫০০ এর কম	Low Concentration
১৫০০ থেকে ২৫০০	Moderate Concentration
২৫০০ এর অধিক	High Concentration

৬.১.১) শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার

উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের শীর্ষ মার্কেট শেয়ারধারী ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্নে ছক-১৯ এ উল্লেখ করা হলো:

ছক-১৯: শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার

কোম্পানির নাম	উৎপাদন সক্ষমতা	মার্কেট শেয়ার
শাহ সিমেন্ট	১০.৬৬	১৩.৪৯%
ক্রাউন সিমেন্ট	৭.০৮	৮.৯৬%
বসুন্ধরা সিমেন্ট	৫.০৫	৬.৩৯%
লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট	৪.৭	৫.৯৪%
আমান সিমেন্ট	৩.৭৬	৪.৭৫%
ফ্রেশ সিমেন্ট	৩.৬	৪.৫৫%
সেভেন রিংস সিমেন্ট	৩.৫	৪.৪৩%
প্রিমিয়ার সিমেন্ট	২.৮৫	৩.৬০%

হাইডেলবার্গ সিমেন্ট	২.৮৫	৩.৬০%
আকিজ সিমেন্ট	১.২	১.৫১%
অন্যান্য	৩৩.৭৫	৪২.৭২%
মোট	৭৯	১০০%

সূত্র: বাংলাদেশ সিমেন্ট মানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, কোম্পানিসমূহের ওয়েবসাইট ও বার্ষিক প্রতিবেদন

চিত্র-৯: শীর্ষ ১০টি কোম্পানির মার্কেট শেয়ার

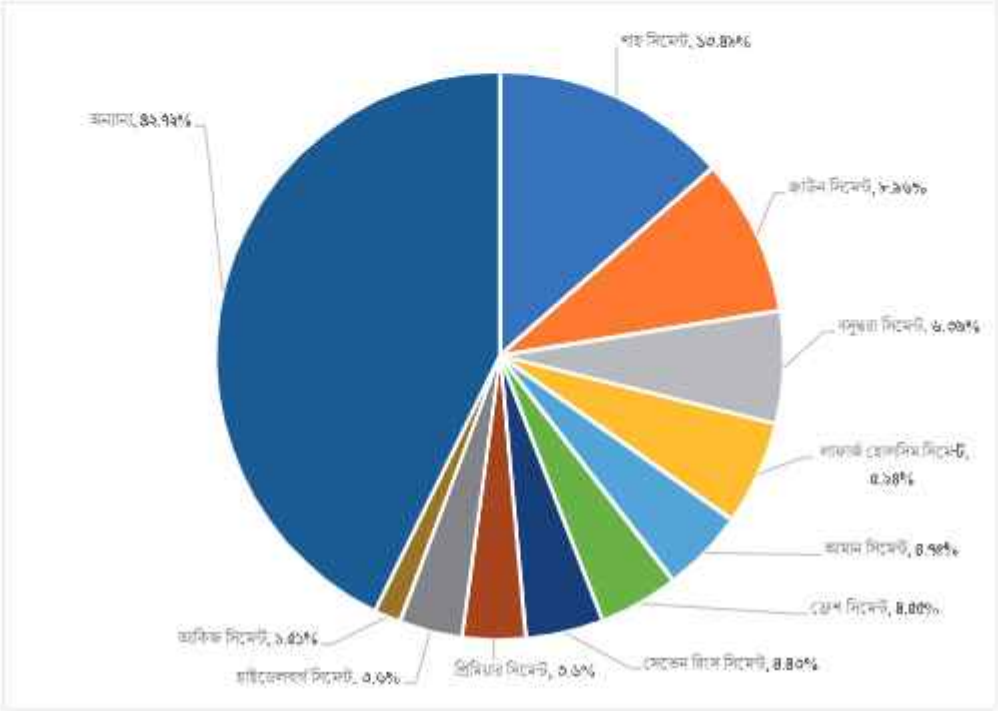

উপর্যুক্ত ছক ও পাই চার্টে আমরা দেখতে পাই যে, উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মার্কেট শেয়ারধারী সিমেন্ট কোম্পানি হলো শাহ সিমেন্ট, যার মার্কেট শেয়ার ১৩.৪৯%। এছাড়া ২য় ও ৩য় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ক্রাউন সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্ট, যাদের মার্কেট শেয়ার যথাক্রমে ৮.৯৬% ও ৬.৩৯%।

উপর্যুক্ত ১৯ নং ছকে বর্ণিত তথ্যাবলী CR4 ও HHI এর মাধ্যমে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

৬.১.২) CR4 ভিত্তিক মতামত

CR4 এর Threshold Value অনুযায়ী সিমেন্টের বাজার কাঠামো সম্পর্কে নিম্নের মতামতসমূহ প্রদান করা হয়েছে:

ছক-১৯ এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে মার্কেট শেয়ার অনুযায়ী সর্বোচ্চ মার্কেট শেয়ার শাহ সিমেন্ট (১৩.৪৯%), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মার্কেট শেয়ার ক্রাউন সিমেন্ট (৮.৯৬%), তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বসুন্ধরা সিমেন্ট (৬.৩৯%) এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট (৫.৯৪%)। মোট উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে মার্কেট শেয়ার ব্যবহার করে সিমেন্টের মার্কেটের CR4 হিসাব করলে দেখা যায় যে,

CR4= [(১৩.৪৯)+(৮.৯৬)+(৬.৩৯)+(৫.৯৪)]% =	৩৪.৭৮%

উক্ত ৪ টি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফল বা CR4 প্রায় ৩৫%। অর্থাৎ সিমেন্টের মার্কেটের উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৩৫% উপর্যুক্ত ৪ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি উপরে উল্লিখিত CR4 এর মানের সীমা অনুযায়ী ০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সিমেন্টের মার্কেটে Low Concentration বিদ্যমান। অর্থাৎ বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

৬.১.৩) HHI ভিত্তিক মতামত

HHI এর Threshold Value অনুযায়ী সিমেন্টের বাজার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামতসমূহ প্রদান করা হয়েছে:

❖ মোট উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে মার্কেট শেয়ারের ভিত্তিতে সিমেন্টের মার্কেটের HHI হিসেব করলে দেখা যায় যে,

$$HHI = [১৩.৪৯^২ + ৮.৯৬^২ + ৬.৩৯^২ + ৫.৯৪^২ + ৪.৭৫^২ + ৪.৫৫^২ + ৪.৪৩^২ + ৩.৬০^২ + ৩.৬০^২ + ১.৫১^২] = ৪২৯.৪৫$$

সিমেন্টের মার্কেটের সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গের যোগফল বা HHI প্রায় ৪২৯.৪৫, যা ১৫০০ এর কম। এ থেকে বলা যায় যে, সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে সিমেন্টের মার্কেটে Low Concentration বিদ্যমান। অর্থাৎ বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

অধ্যায়-৭: বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

৭.১) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের সিমেন্ট বাজারের প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বাংলাদেশ বিগত এক দশক সময়ে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছে। এইচএসবিসির সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালে গ্লোবাল জিডিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি করবে এবং এর অর্থনীতি বিশ্বের ২৬ তম বৃহত্তম হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (ADP) জন্য ২ লক্ষ ৪৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যা আগের অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৯.২০% বেশি। পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সেহেতু আগামী বছরগুলিতে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দ আরও বাড়বে। বন্যা প্রতিরোধ, মাটি ক্ষয়রোধ এবং পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার প্রায় ৮০ শতাংশ ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে যার মোট খরচ ৩৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

স্বতন্ত্র গৃহনির্মাতাদের নির্মাণে ব্যয় করার ক্ষমতা সরাসরি অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত। রেমিট্যান্স প্রবাহ গত দশকে ৫.৫ হারে বেড়েছে। সরকার রেমিট্যান্সের ২% প্রণোদনা দেয়ার কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৫%, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫% উন্নীত হয়। সরকার শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ পদক্ষেপগুলোর ফলে দেশে দ্রুত বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সিমেন্ট শিল্পের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে:

- রিয়েল এস্টেট খাতের প্রবৃদ্ধি।
- রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি।
- মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।
- সরকারি কর্মকর্তাদের গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদের হার হ্রাস।
- শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

৭.২) বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের চ্যালেঞ্জ

বৈশ্বিক মন্দার কারণে রেমিট্যান্সের প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি হয়নি, শিল্পে বিনিয়োগ হোচট খেয়েছে, ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এসব কারণে সিমেন্ট শিল্প চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। সম্প্রতি ডিজেলের দাম বাড়ায় বাজারে বহুবিধ প্রভাব পড়েছে। চট্টগ্রাম থেকে লাইটার ভেসেল করে সিমেন্ট নিয়ে আসতে খরচ বেড়েছে। সারা দেশে পণ্য পৌঁছে দিতে ব্যয় বেড়েছে, ভারত থেকে যে ফ্লাই অ্যাশ আসে সেখানেও ব্যয় বেড়েছে। এ খাতে সক্ষমতা অনেক বেশি কিন্তু এর তুলনায় চাহিদার পরিমাণ কম। পাশাপাশি ডলারের উর্ধ্বমুখিতার কারণে এলসি খুলতে দেরি হওয়ায় কাঁচামালের সংকটেও পড়তে হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোভিড ১৯ অতিমারীর সময় থেকে শুরু করে সিমেন্ট খাতের ব্যবসায় প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। সিমেন্টের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকারসহ অন্যান্য কাঁচামালের দাম উর্ধ্বমুখী। এর সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি তেলের বাজারে অস্থিরতা সিমেন্ট খাতকে আরো চাপে ফেলে দিয়েছে। এমনিতেই কভিড সংক্রমণ পরিস্থিতির প্রভাবে জাহাজীকরণের ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় এটি আরো বেড়েছে। ক্লিংকার উৎপাদনে ব্যবহৃত কয়লার দামও এ সময়ে বেশ বেড়েছে। এতে একদিকে যেমন পণ্যটির দাম বেড়েছে, অন্যদিকে ক্লিংকার রফতানিকারক দেশগুলো নিজেদের জন্য মজুদ রেখে পরবর্তী সময়ে অন্যদের কাছে বিক্রি করছে। এতে সিমেন্ট উৎপাদনে অত্যাবশ্যকীয় এ কাঁচামালের সংকটও তৈরি হয়েছে। এদিকে ডলারের বিনিময় মূল্যের উর্ধ্বগতিতে কাঁচামাল আমদানি ও মূল্য পরিশোধের সময়ের ব্যবধানে বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে কোম্পানিগুলোর। সর্বশেষ দেশে জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয়ের কারণে পরিবহন ব্যয় বেড়ে গিয়েছে। এতে কোম্পানিগুলোর সরবরাহ ব্যয় বেড়েছে।

বছরে তিন মাস সিমেন্টের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। বাকি নয় মাস অর্ধেক সক্ষমতা অব্যবহৃত থাকছে। অথচ কোম্পানিগুলো ব্যাংকঋণ নিয়ে কারখানায় বিনিয়োগ করেছে। সক্ষমতা কাজে না লাগলেও ব্যাংকের অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে। রডের দামের ওপরও সিমেন্টের ব্যবহার নির্ভর করে। সম্প্রতি রডের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে গিয়েছে। এতে সিমেন্টের বিক্রিও কমেছে। রেমিট্যান্সের ওপরও সিমেন্ট খাতের ব্যবসা নির্ভর করে। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশে মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার এখনো অনেক কম রয়েছে। তাই ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়লে কোম্পানিগুলোর বাড়তি সক্ষমতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে, যা কোম্পানির আর্থিক ফলাফলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৭.৩) জলবায়ু পরিবর্তনে সিমেন্ট শিল্পের প্রভাব

কংক্রিটের প্রধান উপাদান সিমেন্ট আমাদের পরিবেশের বড় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সিমেন্ট বা কংক্রিট উৎপাদন প্রক্রিয়া আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন নিঃসরণে বড় ভূমিকা রাখছে। যুক্তরাজ্যে এক গবেষণায় দেখা গেছে, সারা বিশ্বে যত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় তার আট শতাংশের উৎস এই সিমেন্ট বা কংক্রিট। যদি কংক্রিটকে একটি দেশ ধরা হয় তাহলে সেটি হতো বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনকারী দেশ যার অবস্থান হতো চীন এবং আমেরিকার পরেই। সিমেন্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেন বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সবচেয়ে বেশি দায়ী হিসেবে ধরা হয়।

গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন এখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাচ্ছে জলবায়ু এবং বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। ফলে হুমকির মুখে রয়েছে অনুন্নত এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসকারী মানুষজন। পরিস্থিতির উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং কর্পোরেট কোম্পানিগুলো সাশ্রয়ী এবং টেকসই সমাধানের পথ খুঁজছে। অনেকের ধারণা, সিমেন্ট আধুনিক যুগের একটি নির্মাণ সামগ্রী যা সাম্প্রতিককালে খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও গবেষকদের মতে এর ব্যবহার চলে আসছে গত কয়েক হাজার বছর ধরে।

বিজ্ঞানীদের মতে, ক্লিংকার তৈরি থেকে শুরু করে সিমেন্ট বা কংক্রিট তৈরির এই পুরো প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। কংক্রিট যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন করে তার অর্ধেক নিঃসরিত হয় সিমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের প্রতিক্রিয়ায় আর বাকি অর্ধেক হয় জীবাশ্ম জ্বালানি জ্বালিয়ে ক্লিংকার উৎপাদনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানি সিলেটের লাফার্জ সুরমা ছাড়া বাকি সব উৎপাদকই আমদানি করা ক্লিংকারের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের মতো অনেক দেশের চাহিদার যোগান দিতে বিপুল পরিমাণ ক্লিংকার উৎপাদনে বৈশ্বিক জলবায়ুর ওপর প্রভাব পড়ছে।

নির্মাণ শিল্পে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের হার কমিয়ে আনতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং নামি-দামি কোম্পানিগুলো বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে। কিছু কিছু কোম্পানি ইতোমধ্যে কার্বন নির্গমন উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনেছে। 'নেট-জিরো' বলতে একটি শব্দ বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোকে ব্যবহার করতে শোনা যায়। এর মানে হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে তারা কাজ করছে। উন্নত দেশগুলোও এখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই লক্ষ্যকে সফল করতে। তারা স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে।

উৎপাদন এবং বিক্রয় উভয়ক্ষেত্রে বিপুল হারে প্রবৃদ্ধি হলেও, মানসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব সিমেন্ট বা টেকসই কংক্রিট উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি আশাব্যাঞ্জক নয়। অন্যতম উৎস হলেও সরকারি বা বেসরকারিভাবে সিমেন্ট শিল্পের কার্বন নির্গমন রোধ বা কমানোর কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেই। বিশ্বে বিকল্প উপায়ে সিমেন্টের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশীয় উৎপাদকদের তেমন কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে বহুজাতিক কিছু কোম্পানি সীমিত আকারে পরিবেশ বান্ধব সিমেন্ট উৎপাদন শুরু করেছে। অন্যদিকে একেবারে হাতে গোণা দেশীয় কিছু উৎপাদকও ক্লিংকারের পরিমাণ কমিয়ে স্ল্যাগ বা লাইমস্টোন ব্যবহার বাড়িয়ে নতুন ধরনের সিমেন্ট উৎপাদন শুরু করেছে যা অপ্রতুল হলেও প্রশংসার দাবি রাখে।

বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলো যে প্রক্রিয়ায় কার্বন নির্গমন কমাচ্ছে তা আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো অনুসরণ করতে পারে। এর মধ্যে তিনটি উদ্যোগ খুব আলোচিত হচ্ছে।

- **গ্রিন কংক্রিট:** বিশ্বে নির্মাণ খাতে এখন সবচেয়ে আলোচিত শব্দ 'গ্রিন-কংক্রিট'। এই কংক্রিটের জন্য সিমেন্ট ক্লিংকার কমিয়ে বিকল্প কাঁচামাল যেমন: স্ল্যাগ এবং লাইমস্টোন বেশি দিয়ে উৎপাদন করা হয়। তা ছাড়া গ্রিন কংক্রিটে খুব কম পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়, যাতে ন্যূনতম কার্বন নিঃসরণ হয়। অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে বিবেচিত বিকল্প কাঁচামালগুলো বিভিন্ন ভারী শিল্প যেমন: স্টিল মিল এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়। কাজেই এইরকম কয়েকটি কাঁচামাল বিবেচনায় নেওয়া যায় যেমন: কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পাওয়া ফ্লাইঅ্যাশের ব্যবহার বাড়ানো, স্টিল শিল্পের অ-লৌহ উপাদান স্ল্যাগের ব্যবহার বাড়ানো, ফাইবার গ্লাস বা গ্লাসের বর্জ্য, ধান থেকে তৈরি হওয়া ছাই, পোড়া মাটি। তাছাড়া এখন পর্যন্ত ক্লিংকার যেহেতু পুরোপুরি আমদানি নির্ভর কাজেই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েরও সুযোগ হবে।

  দেশে ঘরবাড়ি নির্মাণে কম ফ্লাইঅ্যাশ এবং বেশি ক্লিংকারের সিমেন্টের প্রতি ক্রেতাদের বেশি আগ্রহ দেখা যায়। তাদের অনেকের ধারণা ফ্লাইঅ্যাশ দিয়ে তৈরি সিমেন্টে স্থাপনা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এই ধারণাটি বদলাতে হবে। তাদের জানাতে হবে গ্রিন কংক্রিটের বিল্ডিংয়ে ব্যবহারযোগ্য জায়গা বেশী থাকে, স্থাপনা শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, আগুনের বা সূর্যের তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি থাকে। সর্বোপরি, গ্রিন কংক্রিটের ভবন লবণসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক দ্রব্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা দেয়।

- **কংক্রিটের রিসাইক্লিং:** আমাদের দেশে এখনো এই ধারণাটি প্রচলিত নয়। উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কংক্রিট রিসাইক্লিং করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা হয়। এতে ক্লিংকার বা সিমেন্ট উৎপাদন কম হয়, ফলে কার্বন নির্গমনও কমে যায়।

- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা বর্জ্য পুনর্ব্যবহার:** বহুজাতিক কিছু কোম্পানি এখন অন্যান্য খাতের বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে হাত দিচ্ছে। তারা বিভিন্ন শিল্প যেমন: গার্মেন্টস, খাদ্যপণ্য এবং কৃষি খাতের বিভিন্ন বর্জ্য সংগ্রহ করে এবং যৌথ খরচে প্রক্রিয়াকরণ করে পুনরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা নানান কাজে ব্যবহার করছে এবং সিমেন্ট উৎপাদনেও কাজে লাগাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে আমাদের দেশে সরকারিভাবে উৎসাহিত করা উচিত।

  কাজেই সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ক্লিংকারের পরিমাণ কমিয়ে বিকল্প কাঁচামাল ব্যবহার, গ্রিন কংক্রিট বা গ্রিন বিল্ডিংকে উৎসাহিত করা, পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী উৎপাদকদের প্রণোদনা দেওয়া এবং নির্মাণকারীদের পরিবেশের বিষয়ে আরও সচেতন করার মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারি।

  আমাদের উচিত এখনই কাজ শুরু করা যাতে দেশীয় সিমেন্ট উৎপাদন বা কংক্রিট শিল্পে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনা যায়। অন্যথায় উন্নত দেশগুলো একসময় কার্বন নিঃসরণ তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের দায় আমাদের উপরও চাপাবে এবং জলবায়ু সম্পর্কিত সাহায্য সহযোগিতাও কমে যেতে পারে। আশা করি সরকার ও উদ্যোক্তারা এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

অধ্যায়-৮: সমীক্ষালব্ধ ফলাফল (Findings) ও সুপারিশসমূহ (Recommendations)

৮.১) সমীক্ষালব্ধ ফলাফল (Findings)

- সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহের মোট উৎপাদন সক্ষমতা ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন হলেও বাংলাদেশে সিমেন্টের মোট চাহিদা ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থাৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় অর্ধেকই অব্যবহৃত থাকছে। ৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের জন্য যে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ করা হয়েছে তার সুদ এবং ইনস্টলকৃত যন্ত্রপাতির অবচয় ব্যয়ের কারণে সিমেন্টের দাম বাড়ায় ভোক্তার উপর চাপ বাড়ছে।
- সিমেন্ট উৎপাদনের মোট ব্যয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশই কাঁচামাল ক্রয় বাবদ। যেহেতু উক্ত কাঁচামাল প্রায় পুরোটাই আমদানি করতে হয়, সেহেতু কাঁচামালের দাম হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সিমেন্টের বাজার মূল্য অতিমাত্রায় সম্পর্কযুক্ত।
- বাংলাদেশের বাজারে মোট মার্কেট শেয়ারের প্রায় ৫৭.২৮% শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অবশিষ্ট ২৫% কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাজারের ৪২.৭২%।
- Concentration Ratio 4 পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে সিমেন্টের বাজারে Low Concentration বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ সিমেন্টের বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

৮.২) সুপারিশসমূহ (Recommendations)

- যেহেতু সিমেন্ট উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় অর্ধেক অব্যবহৃত থাকছে সেহেতু রপ্তানির নতুন বৈদেশিক বাজার চিহ্নিত করে উৎপাদন সক্ষমতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- সিমেন্টের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, কোম্পানিগুলোর বাজার মূল্য কাছাকাছি। তাই সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের মধ্যে Price Parallelism এর প্রবণতা রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- সিমেন্টের বাজারে যোগসাজশসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন কিংবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে কিনা তা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ অনুযায়ী যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সিমেন্ট কোম্পানিসমূহ গ্রীন কংক্রিট, কংক্রিটের রিসাইক্লিং ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ায় কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানাগুলো নদীর পাড়ে অবস্থিত বিধায় পণ্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট নৌযান চলাচলের ফলে সৃষ্ট পানি দূষণ ও কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যের ফলে সৃষ্ট পানি দূষণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

সিমেন্ট শিল্পে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পেছনে প্রধান কারিগর বেসরকারি উদ্যোক্তারা। কার্বন নির্গমন প্রতিরোধ সম্পর্কিত কিওটো প্রটোকল স্বাক্ষর করায় ইতোমধ্যে চীনসহ অনেক দেশ শ্রমঘন শিল্পকারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তর শুরু করেছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব সিমেন্ট শিল্প কারখানার প্রসার ঘটানো সম্ভব। ফলে সিমেন্ট উৎপাদন শিল্পে বাংলাদেশ এশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। বৃহদাকৃতির অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হওয়া ও বর্ধিত নগরায়ণ, শহরাঞ্চলে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ও বহুতল দোকানপাট নির্মাণ কাজ সম্প্রসারণ এবং গ্রামের সচ্ছলদের আধুনিক বাড়িঘরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় সিমেন্টের চাহিদা তুলনামূলকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণে বেসরকারি কোম্পানিসমূহ সিমেন্ট উৎপাদন এবং রপ্তানি উভয় কর্মকাণ্ডে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

অনেক দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত সিমেন্ট উৎপাদন করতে পারে না এবং তারা আমদানির উপর নির্ভর করে। তবে সিমেন্টের স্থানীয় চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্থানীয় চাহিদার তুলনায় স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সিমেন্ট রপ্তানির বাজার আরো প্রসারিত করতে পারলে তা আমাদের দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।

রেফারেন্স (References)

১। www.epb.gov.bd

২। www.bbs.gov.bd

৩। www.bb.org.bd

৪। www.bcma.com.bd

৫। Bangladesh Cement Industry: Resilient; Better Days Await (August, 2019) by EBL Securities Limited.

৬। Annual reports of the listed cement manufacturing companies.

৭। Ahmed, S., Rahman, M. A., Islam, M. R., & Hasan, M. (2020). Assessment of ambient air quality and health risks due to air pollution in the vicinity of cement plants in Bangladesh. Environmental Science and Pollution Research

৮। Mahima V. Tiwari, Dr. Sanjeev Gupta, Dr. Shakuntala Mishra (2020), International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)

৯। Bangladesh Cement Industry Review: A major hiccup in 2019; can the industry turn around? by EBL Securities Limited

Bangladesh Competition Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ccb.gov.bd